কামরূপ কামাখ্যা

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

কলিকাতা পুস্তকালয়
[illegible]নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
মাখনলাল চক্রবর্ত্তী
১৩নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য
মণীন্দ্র প্রেস
৮বি, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

লেখকের কথা

শক্তি ছাড়া কিছুই হয় না। সাধারণ চলাফেরা হতে আরম্ভ করে বিরাট কাজ করার মূলে রয়েছে শক্তির বিচিত্র লীলাকৌশল। সেই কৌশলের মূলে যিনি রয়েছেন—যিনি সমস্ত বিশ্বের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করছেন সেই মহাশক্তি মহামায়ার এক অঙ্গ পতিত হয়েছে মুক্তিতীর্থ কামরূপে। সেই অঙ্গের নাম যোনিমণ্ডল। তারই এক সর্বজন পরিচিত কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। জানিনা আমার এই লেখা কতটুকু সার্থকতা লাভ করেছে। সে বিচারের ভার আমি ছেড়ে দিচ্ছি সহৃদয় পাঠক সমাজের হাতে। ইতি—

বিনয়াবনত

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

কামরূপ কামাখ্যা

বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন রাজা দক্ষ। তবু তাঁর মনে শান্তি ছিল না। কেন না ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার লোক কোথায়? তিনি আর তাঁর স্ত্রী। জীবদ্দশায় যতটা ভোগ করার ক্ষমতা ঠিক ততটুকুই করেন। কিন্তু তাঁদের দেহান্তর ঘটলে ঐ বিপুল সম্পত্তি দেখাশোনা করবে কে? কোন সন্তান নেই। তাই দক্ষদম্পতির মনে নেই সুখ, শান্তিও অস্তমিত।

সন্তানলাভের আশায় দক্ষদম্পতি তপস্যা করতে লাগলেন। দুশ্চর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তাঁদের প্রতি প্রীত হয়ে বরদান করলেন, হে দক্ষরাজ, তুমি অচিরে এক সন্তানের পিতা হবে। তবে সে সন্তান পুত্র নয়, কন্যা। কন্যা হলেও সে হবে অতিশয় সৌভাগ্যবতী।

এই বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন দেবগণ। দেবতাদের দৈববাণী শুনে আনন্দ জাগলো রাজা দক্ষের মনে। এতদিন ধরে তিনি যার আশা মনে মনে করেছিলেন—যার পথ চেয়ে এতদিন বসেছিলেন সে আজ আসছে তাঁর ঐশ্বর্য্যময় গৃহে। এবার তাঁর মনে আর দুঃখ নেই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করার লোকের অভাবের কারণে। ভোগ করার লোক আসছে। দৈববাণী কখনো ব্যর্থ হবে না।

রাজা দক্ষ আনন্দিত মনে ছুটে চলে এলেন স্ত্রীর কাছে। তাঁকে জানালেন, আমাদের দুশ্চর তপস্যা সার্থক হয়েছে। আমরা অচিরে সন্তানের জনক-জননী হবো। দৈববাণী শুনেছি। তাতে করে এটুকু জানতে পেরেছি, আমাদের ঘরে শীঘ্রই নাকি একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সন্তানটি হবে অতিশয় সৌভাগ্যবতী।

স্বামীর কথা শুনে সাতিশয় আহ্লাদিত হলেন দক্ষপত্নী প্রসূতি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে স্বামীর কাছে জানালেন, এতদিন আমাদের ঘর শূন্য ছিল বলে দুঃখ ছিল এবার তা পূর্ণ হবে জেনে সত্যি যার পর নেই আনন্দিত হলুম।

যথাসময়ে দক্ষপত্নী গর্ভবতী হলেন এবং তার কিছুকাল পরে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। এই কন্যাসন্তানই উত্তরকালে সতী নামে মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়ে জগদ্‌বিখ্যাত হন।

কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে রাজা দক্ষ তার জাতকর্মাদি করলেন।

ক্রমে কন্যাসন্তানটি বড় হতে লাগলো। তার নাম রাখা হলো সতী। রূপে এবং গুণে সতী সত্যিই অতুলনীয়া।

লেখাপড়ার তুলনায় খেলাধূলায় সতীর মন মেতে উঠতো বেশী। মাটি দিয়ে শিবের মূর্তি গড়ে শিব পূজোর খেলা করতো সতী। এর জন্যে সে পিতামাতার কাছে কম তিরস্কার লাভ করে নি।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সতীর দেহে প্রকাশ পেল যৌবন। তথাপি সে শিবপূজো ত্যাগ করে নি।

পিতা দক্ষ নিষেধ করলেন কন্যাকে, তুমি শিবপূজো করতে পারবে না।

কিন্তু সতী তার সেই শিবপূজো ত্যাগ করলে না। সে একবার স্পষ্টভাবে জানালে তার পিতামাতাকে, আমি কখনো শিবপূজো ত্যাগ করতে পারবো না। কারণ আমি জানি, শিবই হচ্ছেন আমার পতি।

কন্যার এই ধরণের কথা শুনে রুষ্ট হলেন রাজা দক্ষ। তিনি স্থির করলেন, অচিরে এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হোক। সেই সভায় দেশ-বিদেশের রাজা-মহারাজারা আসবেন। সতী তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে নির্বাচন করে তার গলায় মালা দিয়ে পতি হিসেবে বরণ করলে তবেই শান্তি পাবো।

স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হলো যথাসময়ে। উজ্জল

সাজপোষাকে সজ্জিত হয়ে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক রাজা-মহারাজা এলেন।

এক সময় সেই সভায় শিবও এলেন। তাঁর অঙ্গে পোষাক-আশাক কিছুই নেই। এলো গা। পরণে বাঘছাল।

শিব এসে স্বয়ম্বর সভার একধারে বসে রইলেন।

ওদিকে সতী সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে হাতে বরমাল্য ধারণ করে ধীর পদে প্রবেশ করলেন স্বয়ম্বর সভায়।

অনেক রাজা-মহারাজাকে নিবাশ করে শেষকালে সতী এসে দাঁড়ালেন শিবের কাছে। তাঁকেই তার পতিরূপে মনোনীত করে তাঁর কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিলেন।

সতীর ঐ প্রকার ব্যবহারে রুষ্ট হলেন রাজা দক্ষ। কিন্তু রুষ্ট হলে কি হবে তিনি যখন স্বয়ম্বর সভার আহ্বান করেছেন এবং কন্যাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ঐ সভায় তার মনোমত পতি নির্বাচন করার, তখন সতীর এই প্রকার নির্বাচনে মনে মনে অসুখী হলেও শিবের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর সতী স্বামীর ঘরে গিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে লাগলেন।

ওদিকে রাজা দক্ষ সর্বস্তরের জীবের মঙ্গল কামনায় এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে দেবতা হতে আরম্ভ করে বনের পশুপক্ষী পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হলেন। কেবল নিমন্ত্রিত হলেন না শিব এবং তাঁর স্ত্রী সতী। রাজা দক্ষ মনে-প্রাণে শিবকে ঘৃণা করতেন এবং তাকে বিয়ে করার জন্যে কন্যার প্রতিও তাঁর এমন অবহেলা।

যাহোক যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হলো। সতী দেবর্ষি নারদের মুখে জানতে পারলেন যে তাঁর পিতা তাঁর স্বামীকে ঐ যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানান নি। তখন সতী নিজের স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে চলে এলেন পিত্রালয়ে।

সতীকে দেখামাত্র রাজা দক্ষ তাঁকে নানাপ্রকার কটু বাক্য শোনালেন এবং যজ্ঞ-সভায় সমস্ত অতিথিদের সামনে তাঁর স্বামীর নিন্দা করলেন।

সাধ্বী রমণী সতী স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সেই যজ্ঞসভায় দেহত্যাগ করলেন।

সতীর দেহত্যাগের সংবাদ এসে পৌঁছালো কৈলাসে শিবের কাছে।

শিব তখন উত্তেজিত হয়ে দলবল নিয়ে চলে এলেন রাজা দক্ষের যজ্ঞসভায়। মৃত সতীর দেহ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। সতীর শোকে পাগলপ্রায় শিব দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করে দিলেন। তারপর তিনি প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে পাগলের মত সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। তিনি তখন ভুলে গেলেন তাঁর নিত্যকার জীবনযাত্রা এবং তপস্যার কথা।

শিবের ঐ প্রকার উন্মত্ত ভাব দেখে স্বয়ং বিষ্ণু অধীর হলেন। তিনি ভাবলেন, শিবের দেহ থেকে মৃত সতীর দেহ যদি বিচ্ছিন্ন করা না যায় তাহলে ঘটবে এক অঘটন কাণ্ড। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা শিবকে শান্ত না করলে প্রকাশ পাবে জগৎ সংসারে ব্যাপক অমঙ্গল।

এই প্রকার চিন্তা করে জগৎপালক বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ কর্তন করতে লাগলেন। শিব ঐ দেহ নিয়ে যেখানে যেখানে ভ্রমণ করেছিলেন সেখানে তার অংশ পতিত হলো। প্রথমে পৃথিবীতে 'দেবীকূট' নামক স্থানে পতিত হলো সতীর পদযুগল। তারপর 'উড্র' নামক স্থানে পতিত হলো সতীর উরুযুগল। কামপর্বতের কামরূপে পতিত হলো তাঁর যোনিমণ্ডল।

এভাবে ভারতের একান্নটি স্থানে সতীদেহের বিভিন্ন অংশ পতিত হয়ে কালে ঐ সমস্ত স্থান পরিণত হলো এক একটি মহা তীর্থে।

স্বয়ং শিবও সতীর প্রতি অনুরাগবশত ঐ সমস্ত স্থানে লিঙ্গমূর্তিতে

বিরাজ করতে লাগলেন। এভাবে শিব-সতীর মাহাত্ম্য আদিকাল হতে ভারতের বুকের ওপর চিরগৌরবে বিরাজমান রয়েছে।

এই একান্নপীঠের মধ্যে কোন পীঠই গুরুত্ব এবং মর্য্যাদায় কম নয়। বিশেষ করে কামাখ্যা পীঠ।

ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত নীলাচল পর্বতের ওপর কামাখ্যা মন্দির তীর্থ-যাত্রীদেব কাছে এক মহাতীর্থ। গৌহাটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার বা তিন মাইল দূরে কামাখ্যা মন্দির। ভূমিতল হতে মন্দির পাঁচশো পঁচিশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এই পাহাড়ে আর একটি মন্দির আছে। সেটি হচ্ছে দেবী ভুবনেশ্বরীর। তার উচ্চতা ভূমিতল থেকে ছশো নব্বুই ফুট।

আগে কামাখ্যা পাহাড়ে ওঠার জন্যে মোট চারটি পথ ছিল—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম। এর জন্যে বিশেষ নিয়মও প্রচলিত ছিল।

পূর্বেতু ধনকামস্তু রাজ্যকামস্ত পশ্চিমে।
উত্তরে মুক্তিকামস্ত দক্ষিণে মরণং ধ্রুবম্॥

পূর্বদিকে যে পথ সেই পথ দিয়ে মন্দিরে এলে ধন লাভ হয়। পশ্চিমের পথ দিয়ে এলে হয় রাজ্যলাভ। মুক্তিলাভের আশা থাকলে আসতে হবে উত্তরের পথ ধরে। আর দক্ষিণের পথ ধরে এলে মৃত্যু অনিবার্য।

এখন দু'টি মাত্র পথ যাত্রীদের জন্যে উন্মুক্ত আছে—দক্ষিণ আর পূর্বদিকের পথ। উত্তর ও পশ্চিম দিকের পথ নিতান্ত সংকীর্ণ বলে যাত্রীরা সেখান দিয়ে যাতায়াত করেন না। পূর্বদিকের পথটাই যাত্রীদের কাছে অধিকতর প্রিয়। আগে পাণ্ডু ও গৌহাটি স্টেশনের মাঝখানে কামাখ্যা নামে একটি স্টেশন ছিল। যাত্রীরা তখন এই স্টেশনে নেমে পূর্বদিকের পথ দিয়ে উঠতেন পাহাড়ের ওপর। এখন সেই স্টেশন আর নেই। এখন পাণ্ডু বা গৌহাটি স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। সুতরাং যাত্রীদের ভাগ্যে অনেক সুযোগ

সুবিধা আসার ফলে তাদের আর অধিক পরিশ্রম করতে হয় না এই তীর্থে এসে।

এখন যেখানে গৌহাটি সহর প্রাচীনকালে তারই নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। পুরাণে আছে, প্রাচীনকালে এখানে এক দানব রাজা বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল মহীরঙ্গ। তাঁকে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরও বলা হতো। তাঁর মৃত্যুর পর চার পুত্র রাজা হন। তারপর নরক ষোল বছর বয়সে ওখানকার রাজা হন।

রামায়ণ ও মহাভারতে এই অঞ্চলের কথা লেখা আছে।

অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ চ।

ব্রহ্মা এখানে নক্ষত্র সৃষ্টি করেন। আগে এখানে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হতো।

আগেকার দিনে কামরূপ ছিল এক বিশাল রাজ্য। কেবল আসাম প্রদেশই এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাংলার জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও কুচবিহার রাজ্যও ছিল কামরূপের মধ্যে। পুরাণ ও তন্ত্রেও এই কামরূপের সীমার কথা লেখা আছে:

'করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াস্তু পশ্চিমে॥
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥'

করতোয়া থেকে দিক্করবাসিনী পর্যন্ত কামরূপের বিস্তার, পশ্চিমে করতোয়া নদী ও পূর্বে তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষু নদী, উত্তরে কঞ্জগিরি ও দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম।

'ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুত্তমম্॥'

এই সুরাসুর সেবিত ত্রিকোণাকার কামরূপ রাজ্য একদিকে একশো যোজন এবং অন্যদিকে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত ছিল।

এখনকার দিনে পরিচিত পাথরাজ নদীই আগেকার দিনে

করতোয়া নামে পরিচিত ছিল। ঐ নদীটি তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সদিয়ার কাছে যে নদীটি রয়েছে তার নাম কামরূপপুত্র। এই নদীই কামরূপের পূর্ব সীমানা। কঞ্জগিরি এখন ভুটানের অন্তর্গত একটি পার্বত্য প্রদেশ।

কামরূপ বুরঞ্জির মতানুসারে কামরূপের আদি সীমানা ছিল উত্তরে কঞ্জগিরি, পূর্বে মহাচীন, পশ্চিমে করতোয়া নদী আর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের শাখা লাক্ষা নদী।

কামরূপ কামাখ্যায় রাজা নরকাসুর দেবী কামাখ্যার মন্দির নির্মাণ করেন।

দেবতাদের চেষ্টায় সতীদেহের বিভিন্ন অংশ যখন সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হলো এবং শিবের স্কন্ধদেশে যখন সতীদেহের অবশিষ্টাংশ আর রইলো না তখন শিব সতীর মায়া ত্যাগ করে পুনরায় যোগে বসলেন। গভীর যোগসাধনায় মন নিয়োজিত করার ফলে তিনি ভুলে গেলেন বাহ্য চেতনা।

ওদিকে শিবকে প্রগাঢ়ভাবে তপস্যা করতে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা। তাঁর মনে আর শান্তি-সুখ রইলো না। তিনি চেয়েছিলেন সতীর গর্ভে শিবের ঔরসে যে মহাবলশালী সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সেই একদিন বধ করবে অজেয় অসুরশক্তিকে। তার ফলে স্বর্গ ও পৃথিবীতে ফিরে আসবে অনন্ত ও অখণ্ড শান্তি। কিন্তু ব্রহ্মার সে আশা কার্যক্ষেত্রে সফল হলো না। পিতা কর্তৃক স্বামী মহাদেব অপমানিত হয়েছেন এই লজ্জা গোপন রাখতে না পেরে তিনি দেহত্যাগ করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি হিমালয় রাজকন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যুবতী পার্বতী পূর্ব কথা স্মরণ করে শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্যে তাঁর তপস্যায় জীবন পণ করেন। তাঁর কঠোর তপস্যা দেখে দেবতারা সন্তুষ্ট হলেন।

শিবের কিন্তু ওদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পার্বতী শত চেষ্টা করেও তাঁর ধ্যান ভাঙাতে পারলেন না।

অবশেষে মদন বা কামদেব ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝে নিজেই এসে দাঁড়ালেন শিবের সামনে। শিব ছিলেন ধ্যানস্থ। পার্বতী তাঁর অর্চনায় ব্যস্ত ছিলেন। পার্বতীর তপস্যা দেখে তুষ্ট হলেন মদন। ভাবলেন, এইতো অপূর্ব সময়। এই সুযোগে শিব-পার্বতীর মিলন ঘটালে ব্রহ্মার আশা সিদ্ধ হবে।

ফুলসাজে সেজে এসেছেন মদন। তার হাতে যে তীর-ধনুক তাও ফুল দিয়ে সাজানো।

পার্বতী যখন সুগন্ধি বনফুলের মালা নিয়ে শিবের কণ্ঠে পরাতে যাবেন ঠিক সেই সময় মদন নিক্ষেপ করলেন ফুলশর শিবের প্রতি!

মদনের ফুলশরের সম্মোহনী শক্তি লাভ করে ধ্যান ভেঙে গেল মহাদেবের। সামনে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর প্রগাঢ় ধ্যান ভাঙার কারণ হচ্ছেন মদন। সুতরাং মদনের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন মহাদেব। তাঁর প্রশস্ত ললাট হতে বিদীর্ণ হলো বিদ্যুৎ শিখা। তাঁর তেজে দগ্ধ হলেন মদন।

মদনের শোচনীয় পরিণাম দেখে মদনপত্নী হতাশ হয়ে গভীর শোক প্রকাশ করলেন। শম্ভুর কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা জানালেন, হে দেব! আমার স্বামীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে ওকে পুনর্জীবন দান করুন। কারণ আপনি অন্তর্যামী। আপনি আমার মনের অবস্থা অনায়াসে বুঝতে পারছেন। আপনার কাছে আমি আবার জানাচ্ছি, স্ত্রীর কাছে স্বামীই হচ্ছে একমাত্র অর্থ ও সম্মান। স্বামীহীন জীবন স্ত্রীর পক্ষে অতীব বিড়ম্বনাময়। সুতরাং আপনি দয়া করে আমার স্বামীর আয়ু ফিরিয়ে দিন।

মদনপত্নীর কাতর প্রার্থনায় তুষ্ট হলেন মহাদেব। তাঁর শক্তি সঞ্চার করলেন ভস্মীভূত মদনের দেহে। তাঁর শক্তি লাভ করে মদন পুনরায় জীবন লাভ করে স্ত্রীর কাছে এলেন।

স্ত্রী অনেকক্ষণ পরে তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করলেন।

পুনর্জীবন লাভ করে মদন খুসী হতে পারলেন না। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, শরীরটা পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে। তাঁর সেই পূর্বেকার সুন্দর রূপ আর নেই।

তখন মদন দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে স্মরণ নিয়ে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলেন, হে মহাদেব! আমার শত কোটি অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার প্রতি আপনি যদি সত্যিই প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে আপনি এই বর দান করুন যাতে আমি পুনরায় আমার পূর্বরূপ ফিরে পাই।

মহাদেব প্রথমে মদনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন না। পরে মদনপত্নীর কাতর অনুনয় বিনয় দেখে তাঁর মনে কেমন যেন দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি মদনকে আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার কল্যাণ হোক মদন। তুমি যদি তোমার পূর্বরূপ লাভ করতে চাও তাহলে এখুনি তুমি চলে যাও নীলপর্বতে। সেখানে সতীর মহাঅঙ্গ গুপ্তভাবে রয়েছে। তুমি তাকে ব্যক্ত করে আরাধনা করো। দেখবে তাঁর কৃপায় পূর্বরূপ লাভ করেছ।

শিবের কথামত চলে এলেন মদন কামরূপে। সেখানে ব্রহ্মপুত্র নদীর জলে অবগাহন করে কামাখ্যা মায়ের তীর্থ অনুসন্ধান করে বেড়ালেন। অবশেষে মায়ের সন্ধান পেয়ে সেখানে এক সুন্দর মন্দির তৈরী করার ভার অর্পণ করলেন দেবতাদের বাস্তুকার বিশ্ব-কর্মাকে। তিনি সানুচর দিবারাত্র পরিশ্রম করে গড়ে তুললেন এক সুন্দর মন্দির। তার নাম রাখলেন 'আনন্দধাম'। কেবল তাই নয় 'মনোভব গুহা' নামে কামদের ঐ মন্দির সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করলেন।

কামাখ্যা মায়ের অর্চনা করে কামরূপ ফিরে পেলেন নিজের পুরনো রূপ। তাই দেখে সকলে আনন্দিত হলেন।

অতঃপর কামরূপকে চারটি ভাগে বিশষরূপে চিহ্নিত করা হলো.—কামপীট, রত্নপীট সৌমার ও স্বর্ণপীট। এগুলির মধ্যে কামপীট হচ্ছে সকলের শ্রেষ্ঠ। এর অনতিদূরে অবস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। এই পুরে একদা রাজধানী ছিল নরকাসুরের।

রাজা নরকাসুর হচ্ছেন ধরিত্রীর পুত্র। বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে ধরিত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নরক। রজঃস্বলা ধরিত্রীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে জন্মেছেন বলে নরক অসুরযোনি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর গর্ভে মহাবলশালী অসুর জন্ম নেবেন। তিনি পৃথিবীতে জন্ম নিলে এক মহা অনর্থ ঘটে যাবে এই আশঙ্কায় ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কারণ তাঁরা আর শান্তিতে পৃথিবী বা স্বর্গে বসবাস করতে পারবেন না। অসুর তাঁদের সকল সময়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন।

এইরূপ চিন্তা করে দেবতারা একটি সভায় মিলিত হয়ে তার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা স্থির করলেন, ধরিত্রীর গর্ভদেশ কঠিন বস্তুতে পরিণত করে দেবেন যাতে সন্তান গর্ভদেশে বাস করবে তবে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবে না। এরূপ উপায় অবলম্বন করলে সাময়িকভাবে অন্ততঃ দেবতাগণ শান্তিতে বাস করতে পারবেন। কেন না ব্রহ্মা দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন ধরিত্রীর গর্ভে যে নরকাসুর জন্মেছেন তিনি একদিন না একদিন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবেন। তাঁর আগমন কেউ রোধ করতে পারবে না। তার সাধ্য আমাদের নেই। কারণ স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বরাহদেবের ঔরসে তাঁর জন্ম। একমাত্র বিষ্ণুই পারেন তাঁকে সংহার করতে। এছাড়া অন্য কোন দেবতার অধিকার নেই তাঁর গাত্র স্পর্শ করে। সুতরাং তার জন্ম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা যায়।

সভায় ঘোষিত পিতামহ ব্রহ্মার প্রস্তাব একবাক্যে সমর্থন করলেন দেবগণ। সেদিন থেকে ধরিত্রীর গর্ভ কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে উঠলো।

পূর্ণগর্ভা ধরিত্রী তা উপলব্ধি করলেন। ওদিকে প্রসবকাল উপস্থিত হলো। প্রসব যন্ত্রণা অনুভব করলেন ধরিত্রী। গভীর আগ্রহ, আশা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে ক্ষণ গুণতে লাগলেন সন্তান প্রসব করার জন্যে।

কিন্তু তাঁর সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। শিশু নরক আর ভূমিষ্ঠ হলেন না। যোনিদ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার কঠিন শিলার মত হয়ে গেছে। তার নেই সঙ্কোচন প্রসারণ শক্তি। সুতরাং শিশুর পক্ষে ঐ অবস্থায় গর্ভদেশ হতে বেরিয়ে আসা এক সুদুষ্কর ব্যাপার হয়ে উঠলো।

তখন ধরিত্রী প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উচ্চৈস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

তাঁর কাতর ক্রন্দন শুনে বিষ্ণু এলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, একটু ধৈর্য্য ধরো ধরিত্রী। বৃথা কাতর হয়ো না। অচিরে তুমি সন্তান প্রসব করার ক্ষমতা লাভ করবে। আমি জানি তোমার কিরূপ কষ্ট হচ্ছে। তবু তোমাকে সাময়িকভাবে এই কষ্ট সহ্য করতে হবে। কারণ দেবতাদের দ্বারা এই অঘটন ঘটেছে। তাঁদের শক্তির মূল্য আছে বৈকি। আমি পারি সেই শক্তি খণ্ডন করতে। তবে তারও একটা সময় আছে। সেই শুভ সময় আসছে। তুমি তার জন্যে কাতর ভাবে প্রার্থনা জানাও। তাহলে অচিরে তুমি আমার স্নেহ ও আশীবাদ লাভ করে এক সুসন্তানের জননী হবে।

এই বলে ধরিত্রীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করে ও তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন বিষ্ণু।

ধরিত্রী বিষ্ণুর কথামত কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু তার দ্বারাও তাঁর গর্ভযন্ত্রণা বিদূরিত হলো না। তিনি তখন প্রাণপণ শক্তিতে মন-প্রাণ সমর্পণ করে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন। তারপর আরম্ভ করলেন বিষ্ণু স্তব।

অসম্ভব ও অব্যক্ত গর্ভযন্ত্রণায় কাতরা এবং সশঙ্কচিত্তা ধরিত্রীর

আকুল প্রার্থনায় বিগলিত হলো কৃপালু বিষ্ণুর অন্তঃকরণ। তিনি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না বৈকুণ্ঠে।

জগৎকল্যাণস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী তাঁর শ্রীচরণসেবায় নিযুক্তা ছিলেন।

বিষ্ণুকে চঞ্চল হতে দেখে লক্ষ্মী প্রশ্ন করলেন, হে নাথ, কি হেতু আজ আপনি এত চঞ্চল হয়েছেন?

বিষ্ণু বললেন, মা ধরিত্রী আমার জন্যে ব্যাকুল। তিনি অসম্ভব গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করছেন। সন্তান প্রসবকাল উপস্থিত। অথচ সন্তান এখনো প্রসব হচ্ছে না। তাই তিনি বড় চঞ্চল ও ব্যথিত হয়ে পড়েছেন।

লক্ষ্মী তখন বললেন, মা ধবিত্রী প্রসবযন্ত্রণায় কষ্ট পাবার কি কারণ থাকতে পারে তা কি আমি জানতে পারি? আপনি অন্তর্যামী। দয়া করে আমার কাছে সেইসব বৃত্তান্ত জানান। কারণ আমিও মা ধরিত্রীর কষ্ট দেখে চঞ্চল হয়েছি। আমি এসব সংবাদ শুনলে কতকটা আশ্বস্ত হতে পারবো।

লক্ষ্মীব কথামত বিষ্ণু একে একে সমস্ত কথা বললেন। তারপর শেষকালে জানালেন, লক্ষ্মী, আর বেশীক্ষণ আমি তোমার কাছে অপেক্ষা কবতে পারবো না। আমাকে এখুনি মর্তে যেতে হচ্ছে মা ধরিত্রীর কাছে। পবে সেখান হতে ঘুরে এলে তোমার বক্তব্য জানিও।

এই বলে বৈকুণ্ঠ হতে চলে এলেন বিষ্ণু মর্তে। এখানে এসে প্রথমেই তিনি সাক্ষাৎ করলেন ধরিত্রীর সঙ্গে। তাঁকে সান্ত্বনাবাণী শুনিয়ে বললেন, দেবী বসুন্ধরে! তুমি দুঃখিত মনে কাঁদছো কি জন্য? যদি কোনপ্রকার বেদনার কারণে ব্যথিত হয়ে কান্নাকাটি করো তাহলে আমার কাছে জানাও, সে কি প্রকার ব্যাধি। তোমার মুখকমল আগের মত আর তেমন সুন্দর নেই। শরীরে নেই তেমন লাবণ্য। তোমার দৃষ্টিতে প্রকাশ

পাচ্ছে আশঙ্কার দামিনী সংকেত। তাই আগের তুলনায় তোমার নয়নযুগল কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে না। এমন অবস্থায় আর কখনো তোমাকে দেখিনি। তোমার লোকাতীত সৌন্দর্য্য আজ বিপরীতগামিমী। তোমার এইপ্রকার দুরবস্থা লক্ষ্য করে আমি অতিশয় ব্যথিত হয়েছি। কি কারণে তোমার এরূপ অবস্থা হয়েছে তা একবার আমার কাছে প্রকাশ করো।

এই কথা বলার পর মা ধরিত্রীর ভয়কাতর নয়ন পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বিষ্ণু। তাঁর মুখ হতে কোন কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেন।

ধরিত্রীও বিষ্ণুর কথা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। মনে বল পেয়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিনীতভাবে বললেন, হে মাধব! দুর্বহ গর্ভভার বহন করতে অক্ষম হয়ে নিরন্তর দুঃখ অনুভব করছি। এই দুঃখ হতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি যে সময় রজঃস্বলা হই ঠিক সেইসময় আপনি আমার সঙ্গে মিলিত হন। আপনার ঔরসে আমি গর্ভবতী হই। এখন আমার গর্ভধারণের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এইতো সুপ্রশস্ত সময় প্রসবের। কিন্তু এখন আমি প্রসব করতে সমর্থ হচ্ছি না। ফলে আমি ভোগ করছি নিদারুণ প্রসব যন্ত্রনা। আপনি আমার এই প্রকার কষ্ট অনুভব করে তা দূর করতে যত্নবান হোন। আপনি যদি সমূহ বিপদ হতে আমাকে রক্ষা না করেন তাহলে আমি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হবো। আমার মত কোন কামিনীই এমন গর্ভযন্ত্রণায় কষ্ট পায়নি। মদমত্ত হাতী যেমন সরোবরকে আলোড়িত করে তেমনি আমাকে এই গর্ভ কষ্ট অনুভব করাচ্ছে।

বসুন্ধরার দীনবচন শুনলেন পৃথিবীপতি ভগবান। রবিকিরণে সন্তপ্তা লতার মত সন্তপ্তা ধরাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, বসুন্ধরে! তোমার দুঃখ চিরস্থায়ী হবে না এবং তোমার গর্ভ নিরূপিত সময় অতীত হলেও যে প্রসব হয়নি তার কারণ

আছে। তুমি বহুদিন আগে যখন একবার রজঃস্বলা হও তখন বরাহরূপী বিষ্ণু তোমার সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হন। ফলে তুমি হও গর্ভবতী। কিন্তু দেবতারা বললেন, তোমার গর্ভে জন্মেছে এক মহা বলশালী অসুর, সে যদি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে সকলের শান্তি বিঘ্ন করবে। তাই তাঁরা তোমার গর্ভ রোধ করে রেখেছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রসব হতে দিচ্ছেন না। স্বর্গে যদিও তোমার বীরবর পুত্রের জন্ম হয় তাহলে দেব দৈত্য প্রভৃতির সঙ্গে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিলোক নষ্ট হবে। এই কারণে ব্রহ্মাদি দেবগণ লোকহিতের জন্য সৃষ্টির আগে অলৌকিক পরাক্রমশালী পুত্রকে তোমার গর্ভে স্থাপন করেছেন। আদি সৃষ্টি হতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে এই গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। হে চন্দ্রমুখী! যেকাল পর্যন্ত সত্যযুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধভাগ উপস্থিত না হয় সেই কাল পর্যন্ত এই গর্ভ ধারণ করো। বসুন্ধরে! যতদিন পর্যন্ত তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব না হয় ততদিন পর্যন্ত গর্ভভারে তোমার কোন কষ্টই হবে না।

এই কথা বলার পর ভগবান বিষ্ণু গর্ভবতী দয়িতা বসুন্ধরার নাভিমণ্ডলে পাঞ্চজন্য শাঁখের মুখটা স্পর্শ করালেন। তার ফলে পৃথিবীর দেহ লঘু হয়ে গেল। কষ্টপ্রদ দুর্বহ গর্ভ লঘুতর হলে সুখকর বোধ করতে লাগলেন। জগন্মাতা পৃথিবী গর্ভবতী হলেও গর্ভহীনা স্ত্রীলোকের মত আনন্দ বোধ করতে লাগলেন।

এরপর পৃথিবীকে নানারকম সান্ত্বনাবাক্য শোনালেন পৃথিবীশ্বর। তিনি বললেন, হে মনস্বিনী। হে জগদ্ধাত্রী! হে বসুন্ধরে! তুমি যাবতীয় বস্তু ধারণ করে ধরিত্রী নামে গণ্য হয়েছ। তোমার সমান ধৈর্য্যশালিনী আর দ্বিতীয় নেই। তুমি জগতের সকল বস্তু ধারণ করতে সমর্থা এবং সহিষ্ণুতা গুণের প্রতিকৃতি বলেই ক্ষমা নামে প্রসিদ্ধা। তোমাতে সকল ধন নিক্ষিপ্ত রয়েছে। এই কারণে

তোমার আর এক নাম বসুমতী। ধরিত্রী! তুমি আর দুঃখ কোরো না। যখন তোমার পুত্র জন্মাবে তখন আমাকে স্মরণ কোরো। আমি তোমার কাছে এসে তোমার পুত্রকে প্রতিপালন করবো। পৃথিবী! আমি তোমার কাছে যেসব কথা বললুম এসমস্ত অতিশয় সুগোপ্য। সাবধান, কারও কাছে এসব কথা প্রকাশ করবে না। ভাগ্যবতী! ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করলে তোমার গর্ভে যে বালক জন্মগ্রহণ করেছে সে ভুমিষ্ঠ হবে।

এই কথা বলার পর পৃথিবীশ্বর হলেন অন্তর্হিত। ভগবান অন্তর্হিত হলে কৃশাঙ্গী পৃথিবী গর্ভহীনা নারীর মত দ্রুত পদে অন্যত্র যাত্রা করলেন।

বিদেহরাজ্যের অধীশ্বর হচ্ছেন রাজা জনক। তিনি রাজর্ষি। একদিকে সংসারের সকলকর্মে মন আছে অন্যদিকে আবার সর্বমঙ্গলের কারণ এবং সর্বজনসুখনিয়ন্তা ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে মন নিমগ্ন। বিদ্যা, বুদ্ধি, রাজনীতি প্রভৃতি গুণে তিনি গুণান্বিত। তাঁর প্রতি সকল স্তরের প্রাণী শ্রদ্ধাশীল। এ হেন গুণবান নৃপতির মনে সুখ নেই, নেই শান্তি। অতুল ঐশ্বর্য্য রয়েছে কিন্তু তা ভোগ করার মানুষ কোথায়? অতএব রাজা জনক মহা দুশ্চিন্তার মাঝে দিন কাটাচ্ছেন।

হঠাৎ একদিন দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। নারদ বীণা বাজাতে বাজাতে ঈশ্বরের নামগানে মুখর রয়েছেন।

রাজা জনকের কাছে এসে বীণা বাজিয়ে কিছুক্ষণ ঈশ্বরের নাম গান করলেন।

রাজা জনক মনোযোগ দিয়ে সেই নামগান শুনলেন। অমৃত নির্ঝরিনী সেই নামগানের কথা স্মরণ করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। ধন্যবাদ জানালেন মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে।

নারদও সন্তুষ্ট হলেন রাজর্ষির অভিনন্দন লাভ করে। কিন্তু তিনি পুরাপুরিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একটা সন্দেহভাব তাঁর অন্তরাকাশে ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত মিটমিট করে জ্বলছিল। দেবর্ষি তার অনুজ্জ্বল জ্যোতি উপলব্ধি করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, হে রাজন! আপনি তো আমার মুখে ঈশ্বরের নামগুণ শুনলেন। কিন্তু তা শুনে আপনি অমন বিষন্ন হলেন কেন। আপনার মুখমণ্ডলের হাসির চন্দ্রমা প্রকাশ পেলেও আপনার অন্তরাকাশে শোভা পাচ্ছে বিষন্নতার জলদপুঞ্জ। আমি এখন জানতে পারি কি কিজন্যে আপনার এই অবস্থা হয়েছে?

দেবর্ষির বাক্য অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন রাজর্ষি জনক। ক্ষণকাল নীরব থেকে তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে গদগদ কণ্ঠে এবং অশ্রুবিগলিত নয়নে বলতে লাগলেন, হে শক্তিধর! আপনি স্বয়ং বিষ্ণুর দূত। আপনার পক্ষে অজানা বিষয় বলে কিছু নেই। তবু আমি আপনার কাছে প্রকাশ করছি আমার দুঃখের বিবরণ। আমি এই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও মনে শান্তি পাচ্ছি না। তার কারণ হচ্ছে আমি অপুত্রক। করুণাময় ঈশ্বর আমাকে সবকিছু দিয়েছেন কিন্তু বঞ্চিত করেছেন কেবলমাত্র একটি ধনে। সে ধন হচ্ছে পুত্র। আমার এতো বয়েস হয়েছে তথাপি আমি আজও পর্যন্ত কোন পুত্রের জনক হতে পারলুম না। এই দুঃখ আমার অন্তরে অহরহ তীরের ফলার মত খোঁচা মারছে। আপনি কি এর প্রতিবিধান করতে পারেন না? বলতে পারেন না কি করলে আমার এই দুঃখের উপসম হয়?

রাজর্ষি জনক এই কথা বলে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন দেবর্ষির মুখপানে।

দেবর্ষিও অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন রাজর্ষির জীবনদুঃখ। তিনি একবার বীণায় টঙ্কার দিলেন তারপর বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে বলতে লাগলেন, হে রাজন! আপনি অশান্ত হবেন না। শান্ত

হয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। জগৎপতির ইচ্ছা হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়।

একটু থেমে নারদ পুনরায় বললেন, অযোধ্যার রাজা দশরথের নাম শুনেছেন আপনি?

—হ্যাঁ শুনেছি।

—উনিও তো আপনার মত নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান লাভের আশায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞের পুরোহিত হলেন ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শোনামাত্র স্তম্ভিত হলেন রাজা জনক। উদ্বেগমিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি বলছেন আপনি? শুনেছি ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ আজীবন কুমার। তিনি একনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী। জীবনে কখনো স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন নি। তিনি এলেন রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞসভায়! কে নিয়ে এলো তাঁকে?

সে এক মজার কাহিনী রাজন। বলতে গেলে অনেক কথা বলা হয়। সব বলতে সময়ও লাগবে প্রচুর। আপনার কাছে সংক্ষেপে বলছি, একদল বারাঙ্গনা গিয়ে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের লোকলজ্জা বা লোকভয় ভঙ্গ করে! তারপর তাঁকে নিয়ে আসে রাজা দশরথের রাজসভায়।

এভাবে ঋষি নারদের মুখ থেকে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুনে খুসী হলেন রাজা জনক। তিনি প্রশ্ন করলেন, তারপর ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ কি ,করলেন।

নারদ বললেন, ঋষি রাজা দশরথের মনোবাসনা জেনে নিয়ে তাঁর মনোমত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞফলও প্রকাশিত হলো। রাজা লাভ করলেন চারটি গুণবান পুত্র। ফলে তাঁর মন হতে বহু দিনকার সঞ্চিত পুত্রহারার দুঃখ গেল নাশ হয়ে।

নারদের কথা শুনে রাজা জনক বললেন, তাহলে আমি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে আমার রাজসভায় নিয়ে আসি' তিনি যদি আমার

জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই পুত্রলাভ করবো।

রাজা জনকের কথা শুনে নারদ বললেন, তা আপনি করতে পারেন তবে তিনি কি আপনার রাজসভায় আসবেন ?

—কেন আসবেন না ?

—আপনার সুযোগ্য কুলপুরোহিত গৌতম যে বয়েছেন। কেবল তাই নয়, তাঁর সহায়স্বরূপ তাঁর পুত্র শতানন্দ রয়েছে তাঁর সঙ্গে। সুতরাং ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ এসব কথা বিচাব বিবেচনা কবে আপনার রাজসভায় আসতে অসম্মত হবেন।

আপনি ঠিক বলেছেন দেবর্ষি, বললেন রাজা জনক। তবে আমার মন বলছে, একবার চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি আছে, যদি ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ আসেন আমার রাজসভায়।

নারদ হেসে বললেন, তা আপনি করতে পারেন রাজন তবে তার সঙ্গে এও ভেবে রাখবেন আপনার কুলপুবোহিত গৌতম উপস্থিত থাকতে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আমন্ত্রণ জানানো মহা অন্যায় কর্ম হবে। গৌতম এর জন্যে অপমানিত বোধ করতে পারেন।

কিন্তু রাজা দশরথের তো কুলপুরোহিত আছে! ঋষি বশিষ্ঠের মত কুলপুরোহিত থাকতে তিনি কেন গেলেন ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে ?

নারদ গম্ভীর হয়ে বললেন, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটছে রাজন। একই ব্যাপার একজনের কাছে যে নিয়ম অন্যজনের কাছে তা নাও সম্ভব হতে পারে। বিশেষ করে গৌতমকে আমি জানি। তাঁর ক্ষমতা ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের তুলনায় কম নয়। হ্যাঁ, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে বটে। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ হচ্ছেন আবাল্য ব্রহ্মচারী। তিনি কখনো স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন নি। আর গৌতম ঋষি হয়েও বিবাহিত জীবন যাপন করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর তপঃশক্তি রয়েছে অসাধারণ।

এই কথা বলতে বলতে দেবর্ষি নারদ ঋষি গৌতমের দিকে

তাকিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ঋষি গৌতম আপনি কি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের মত গুরুভারযুক্ত কর্মে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন না ?

ঋষি গৌতম সেখানে আগে থাকতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলীর সামনে করযোড়ে এবং একান্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে আপনি আশীর্ব্বাদ করলে এবং মহারাজার আদেশ হলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

গৌতমের কথা শুনে খুশী হলেন দেবর্ষি নারদ। অতঃপর তিনি রাজা জনককে বললেন, রাজন! আপনি শুনলেন তো ঋষি গৌতমের কথা। এবার তাহলে ওঁর ওপর আপনার যজ্ঞভার অর্পন করুন।

রাজা জনক বললেন, আপনার আদেশ মত আজ আমি ঋষি গৌতমকে আমার পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত রূপে নির্বাচিত করলুম। তাঁকে সাহায্য করবেন অন্যান্য ঋষিগণ। তাঁদের মধ্যে থাকবেন গৌতমপুত্র শতানন্দ।

রাজা জনকের ঘোষণা শুনে প্রীত হলেন ঋষি গৌতম। মনে মনে বিষ্ণুর চরণে প্রার্থনা নিবেদন করলেন, হে জগৎপতি! হে সর্বমঙ্গলকারী! হে সর্বকারণের কারণ! তুমি আমার সহায় হও। আমি যেন অচিরে এই গুরুভার কাজে জয়যুক্ত হতে পারি।

এরপর ঋষি গৌতম মনোযোগ দিলেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করতে। রাজা জনক দেবর্ষি নারদের মুখে সমস্ত কথা শুনে অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে মহিষীদের সঙ্গে দেবর্ষির পরামর্শ বেশ নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। মহিষীরা শুনে খুশী হলেন। তাঁরাও রাজা জনকের সঙ্গে পুত্রোৎপত্তি বাঞ্ছায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হলেন।

যথানিয়মে এবং নির্দিষ্ট শুভ লগ্নে মহা ধুমধাম করে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করলেন রাজা জনক। দেবদানব হতে আরম্ভ করে বনের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত যজ্ঞসভায় আমন্ত্রিত হয়ে এলেন।

ঋষি গৌতম মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ করলেন। যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন অনেক কিছু। তারপর যজ্ঞফল কামনা করে অগ্নি ব্রহ্মার কাছে পুত্র ভিক্ষা করলেন রাজা জনকের জন্যে।

পিতামহ এবং প্রজাসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা গৌতমের নিষ্ঠাপূর্ণ যজ্ঞক্রিয়ায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদান করলেন, হে গৌতম! আমি তোমার সুচারু, নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সুকৌশল যজ্ঞে সাতিশয় আনন্দলাভ করেছি। তোমার যজ্ঞক্রিয়া সফল হোক। অচিরে রাজা জনক পুত্র-কন্যাদেব জনক হবেন।

এই কথা বলে যজ্ঞকর্তা ব্রহ্মা অদৃশ্য হলেন।

ব্রহ্মা অদৃশ্য হলে সেখানে উপস্থিত হলো দু'টি সুন্দর কান্তিযুক্ত পুত্র। তারাই হলো রাজা জনকের পুত্র। পুত্র দু'টি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা জনক দেখলেন যজ্ঞভূমির একধারে প্রকাশ পাচ্ছে একটি রক্তমাংসের সুঠোল হাত। হাতটি অতিশয় সুন্দর।

মাটির মধ্যে ওরকম সৌদামিনী স্বরূপা হাতখানি দেখে বিস্মিত হলেন রাজা জনক। প্রশ্ন করলেন দেবর্ষি নারদকে, ওকি দেখছি দেবর্ষি?

দেবর্ষি হেসে বললেন, ঠিকই দেখছেন বাজন। ও হচ্ছে আপনার কন্যা। আপনি এখুনি হাল দিয়ে যজ্ঞভূমির ঐ জায়গাটি কর্ষণ করুন। তাহলেই আপনি ঐ কন্যাটিকে লাভ করতে পারবেন। কন্যাটি হচ্ছে ধরিত্রীর।

দেবর্ষির কথামত রাজা জনক হাল দিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে লাগলেন। পরে তিনি লাভ করলেন এক সর্বগুণসম্পন্না সুশ্রী কন্যা।

দেবর্ষি নারদ কন্যাটিকে আশীর্বাদ জানিয়ে রাজা জনককে বললেন, মহারাজ! এই কন্যাটি অতিশয় সুলক্ষণযুক্ত। আপনি একে নিয়মিত এবং সুন্দর ভাবে মানুষ করে তুলুন। কালে এ মেয়ে সকলের ঘরে পূজা লাভ করবে।

ঋষির কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন রাজা জনক। অনেকদিন পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে পুত্র-কন্যাদের জনক হয়েছেন। সুতরাং তাঁর মত সুখী আর ক'জন আছে?

এরপর রাজা কন্যার নামকরণ করলেন সীতা। কেননা হালের স্পর্শে কন্যাটি ধরিত্রীর গর্ভ হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছে।

কন্যাটি জন্মলাভ করলে ধরিত্রী সেখানে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি গৌতম, নারদ এবং রাজা জনককে সম্বোধন জানিয়ে বললেন রাজন! ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করলুম। জনক-জননী-কুলপাবনা মঙ্গলময়ী এই কন্যাকে গ্রহণ করো। মহারাজ! এই কন্যা হতে আমার ভার দূর হবে। আমিও দুর্বহ ভার বহন হতে মুক্তিলাভ করবো। এই কন্যার জন্যেই যমশাসক রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসেরা যমের আলয় দেখবে। মহারাজ! তুমিও এই কন্যা হতে পরম আনন্দলাভ করবে। আর এই কন্যা হতেই তুমি দৈবিক ও পৈতৃক ঋণ হতে মুক্ত হবে। হে নরোত্তম! কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যে বিষয় প্রতিজ্ঞা করতে হবে তা নারদ ও গৌতমের সামনে তোমাকে বলছি। রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হলে আমি ভারপীড়া রহিত হয়ে তোমার যজ্ঞভূমিতে সুখে একটি সুপুত্র প্রসব করবো। তুমি রাজশ্রেষ্ঠ। যতদিন তার শৈশব অতিক্রম না হয় ততদিন তুমি তাকে ছেলের মত মানুষ করবে। রাজন! তার বাল্যকাল অতীত হলে আমিই তাকে পালন করবো। তার যাতে মানুষের মত স্বভাব হয় সে বিষয়ে তুমি বিশেষ যত্ন নেবে।

পৃথিবীর এই কথা শুনে আনন্দিত হলেন রাজা জনক। তিনি পৃথিবীকে প্রণাম করে বললেন, জগদ্ধাত্রী! তোমার কথামত আমি তাকে প্রতিপালন করবো কিন্তু তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করো। হে পরমেশ্বরী! প্রসন্ন হও। হে দেবী! আমি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী অবস্থায় তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করি। তুমি

জগজ্জননী শক্তিস্বরূপা। তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

রাজা জনকের কথা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করলেন পৃথিবী। রাজাকে মধুর স্বরে সম্বোধন জানিয়ে বললেন, রাজন! এবার আমার রূপ নিরীক্ষণ করো।

এই বলে পৃথিবী রাজা জনকের কথামত নিজের রূপ দেখালেন। নীলকমল-শ্যামলা দীর্ঘবাহুযুগলে মৃণালসম শুভ্রবর্ণ অক্ষমালা ধারণ করেছেন দেবী। শ্বেতপদ্মের মধ্যে আসিনা রয়েছেন দেবী জগদ্ধাত্রী।

ধরিত্রীর এই সুন্দর রূপ দেখে সন্তুষ্ট হলেন রাজা জনক। তিনি শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানালেন দেবীকে। এরপর দেবী পৃথিবী সীতাকে নিজের হাতে গ্রহণ করে রাজা জনককে বললেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! কালে তোমার এই জগজ্জননী কন্যা মনুষ্যভাব গ্রহণ করবে। তার জন্যে তোমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে.

এই কথা বলে পৃথিবী নারদাদি মুনিকে সম্বোধন জানিয়ে সেখানেই অদৃশ্য হলেন। রাজা জনক পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

এরপর অনেক কাল কেটে গেল। রাজা জনকের ঘরে সীতা মানুষীর মত বড় হতে লাগলেন। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন ঠিক মানুষীর মত। মনে হলো তিনি জগজ্জননী নন তিনি একজন সাধারণ মানবী।

ওদিকে রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে যে চারটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন তাদের নাম হলো রাম, লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন। তারাও দিন দিন বড় হতে লাগলেন। অস্ত্রবিদ্যা হতে আরম্ভ করে সাধারণ বিদ্যা পর্যন্ত আয়ত্ত করলেন। পুত্রগণের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ হলেন রামচন্দ্র। তিনি বিষ্ণুর অংশাবতার। আর তিন ভ্রাতা খণ্ড খণ্ড অংশ ভগবান বিষ্ণুর।

রামচন্দ্র বড় হয়ে অনেক রাক্ষস বধ করে নিজের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিলেন। পরে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলো জনকরাজার কন্যা সীতাদেবীর। বিয়ের আগে রামচন্দ্রকে হরধনু ভঙ্গ করে বীর্য্যের প্রকাশ দেখাতে হলো। সীতাদেবীকে বিয়ে করে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন রামচন্দ্র। এদিকে রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি রাজকাজে অসমর্থ হয়ে পড়লেন। তাই জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে একটু বিশ্রামসুখ উপভোগ করবেন এই আশায় দিন কাটাতে লাগলেন।

রাজা দশরথ যথাসময়ে রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসবার জন্যে সর্ববিধ আয়োজন করতে লাগলেন। অকস্মাৎ এক অনর্থ উপস্থিত হলো। কুব্জা মন্থরার পরামর্শে রাণী কৈকেয়ী বেঁকে বসলেন। তিনি রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী। রাজা দশরথের প্রথমা মহিষীর নাম কৌশল্যা। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রামচন্দ্র। আর সুমিত্রা হচ্ছেন রাজা দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ভরত।

একসময় রাজা দশরথ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইসময় রাণী কৈকেয়ী তাঁর খুব সেবাযত্ন করেন।

রাজা রাণীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দু'টি বর দিতে চাইলেন।

রাণী কৈকেয়ী বললেন, হে রাজন! আমি এখন আর ঐ বর দু'টি নিতে চাই না। পরে যখন সময় ও সুযোগ বুঝবো তখন নেবো।

এবার কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শ মত রাজা দশরথের কাছে ঐ বর দু'টি চাইলেন। তিনি বললেন, হে নাথ! অনেককাল আগে আপনি আমার সেবাশুশ্রূষা লাভ করে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দু'টি বর দান করতে চেয়েছিলেন। আমি তখন সেই বরদু'টি নিই নি। এখন সেই বর দু'টি দিন। এক বরে আমার 'পুত্র ভরত

অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করবে আর এক বরে রাম চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে যাবে।

রাণী কৈকেয়ীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন রাজা দশরথ। তিনি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কেন না তাঁর বড় আশা ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র হবেন অযোধ্যার রাজা। কার্য্যত তা হলো না। রাণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যদি অযোধ্যার রাজা হন এবং রামচন্দ্রকে যদি চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে গমন করতে হয় তাহলে তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করা এক মহা দায় হয়ে উঠবে। অথচ সত্য রক্ষার জন্যে তাঁকে কৈকেয়ীর কথায় রাজী হতে হলো।

অবশেষে স্থির হলো বামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে গমন করবেন আর অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহন করবেন কৈকেয়ীনন্দন ভরত।

রামচন্দ্রের আর অভিষেক হলো না। অভিষেকের আয়োজনও সম্পূর্ণ হয়েছিল। অকস্মাৎ কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা বিনা মেঘে বজ্রঘাত তুল্য হয়ে উঠলো।

বনগমনের সংবাদ শুনে কিছুমাত্র আশঙ্কিত হলেন না অযোধ্যার ভাবী নৃপতি স্বয়ং রামচন্দ্র। তিনি রাজবেশ পরিত্যাগ করে সামান্য বল্কল পরিধান করে বনগমনের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন পতিব্রতা স্ত্রী সীতা এবং একান্ত স্নেহপরায়ণ ভ্রাতা লক্ষ্মণ।

এরপব অনেক কাণ্ড ঘটে গেল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ রাম বিহনে শোকে প্রাণ হারালেন। ভরত তখন মাতুলালয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে এলে মাতা কৈকেয়ী আনন্দিত মনে তাঁকে শুভ সংবাদ নিবেদন করলেন, জানিস ভরত, তুই হবি অযোধ্যার রাজা।

ভরত শুনে অবাক হলেন। প্রশ্ন করলেন, আমার দাদা রামচন্দ্র জীবিত থাকতে আমি কেন অযোধ্যার সিাহাসনে আরোহণ করবো?

রাণী কৈকেয়ী বললেন, রামচন্দ্র বনে গেছে।

এরপর ভরত মাকে নানারকম প্রশ্ন করে সমস্ত ব্যাপারটি জেনে গেলেন। পরে তিনি যখন বুঝতে পারলেন তাঁর মায়ের জন্যে রামচন্দ্র বনে চলে গেছেন তখন তিনি মাতাকে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং পরে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনবার আশায় সদলবলে বন অভিমুখে যাত্রা করলেন।

রামচন্দ্রের কাছে এসে ভরত জানালেন অন্তরের প্রার্থনা, আপনি ফিরে গিয়ে সুখে রাজত্ব করুন। আপনাকে পেলে অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ সুখে কাল কাটাবে।

অনুজ ভরতের কথা শুনে রামচন্দ্র বললেন, আমি তোমার কথা রাখতে পারবো না ভাই। পিতৃসত্য পালনের জন্যে আমি বনে এসেছি। দীর্ঘ চোদ্দ বছর আমাকে এখানে থাকতে হবে। সেই কাল উত্তীর্ণ হলে আমি অযোধ্যায় ফিরে যাবো।

রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অপারগ হয়ে ভরত তাঁর পাদুকাযুগল শিরে বহন করে নিয়ে এলেন। পাদুকাযুগল অযোধ্যার সিংহাসনে রেখে তাকে রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করে রাজত্ব চালাতে লাগলেন।

এভাবে ভরতের দিনগুলি বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে লাগলো। ওদিকে বনবাসে অবস্থানকালে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা-দেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় লঙ্কার রাজা রাক্ষস রাবণ।

অতঃপর রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারেব উপায় চিন্তা করতে লাগলেন' দক্ষিণ ভারতের কয়েকশো বানরসেনার সাহায্যে তিনি লঙ্কায় গেলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে সম্মুখ সমরে পরাজিত ও নিহত করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তাঁকে লঙ্কা অভিযানে সর্বপ্রকার সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করেন ভক্ত হনুমান. সুগ্রীব প্রমুখ বানরগণ।

নররূপী রামচন্দ্রের শরাঘাতে রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হয়েছেন এই সংবাদ শুনতে পেলেন ধরিত্রী। তখন তিনি চলে এলে বিদেহ নগরীতে। রাজা জনক যে স্থানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন মাতা ধরিত্রী সেখানে এলেন। পরে সীতাদেবী যেখানে জন্মগ্রহণ করেন মাতা ধরিত্রী সেখানে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। পুত্র প্রসব করার পর ধরিত্রী পূর্ব প্রতিজ্ঞামত জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন।

ধরিত্রীর স্মরণ বুঝতে পারলেন অন্তর্যামী বিষ্ণু। ধরিত্রী যেখানে পুত্র প্রসব করেন ঠিক সেইস্থানে অবতীর্ণ হলেন পৃথিবীশ্বর।

পৃথিবীশ্বরকে দর্শন ক'রে আনন্দিতা হলেন পৃথিবী। তাঁকে নানাপ্রকার হিতকর বাক্যে সন্তুষ্ট করে বলতে লাগলেন, মহাপ্রভো, এই আপনার অতি কোমলাকৃতি বালক জন্মগ্রহণ করেছে। আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আমার গর্ভ হতে বালক ভূমিষ্ঠ হলে আপনি তাকে লালন পালন করবেন। এখন এই বালক ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সুতরাং আপনি এর দেখাশোনার ভার নিন।

ধরিত্রীর কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন, হে দেবী! মহাপরাক্রমশালী তোমার এই পুত্র মনুষ্যভাব প্রকাশ করে চিরকাল বিজ্ঞজনের মত সুখী হবে। তোমার এই পুত্র যতদিন মানুষের ভাব বজায় রেখে চলতে পারবে ঠিক ততদিন সুখে রাজত্ব করতে পারবে। যখন সে মনুষ্যভাব ত্যাগ করে অন্যভাব গ্রহণ করবে তখন তার পক্ষে সুখে রাজত্ব করা হবে না। এই বালকের যখন ষোল বছর বয়স হবে তখন সে ধন-রত্ন-গজ-ঐশ্বর্য্য-রথসমূহে সমৃদ্ধ রাজ্যভার লাভ করবে। তোমার পুত্র বীর্য্যবান হয়ে বিপুল অক্ষয় রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করে ভোগ করবে। মানুষের মধ্যে যে যে যুগে যে যে ভাব হয় এই বালকও সেইমত নিজের যুগানুরূপ ভাব গ্রহণ করবে। সেইমত যত্ন করো। প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে এক নগরে তোমার পুত্র বেশ সুখে রাজত্ব করবে।

ধরিত্রীকে এই কথা বলে পৃথিবীর সামনে হতে অদৃশ্য হলেন পৃথিবীশ্বর।

মিথিলার অন্তঃপুরে অবস্থান করছিলেন রাজা জনক। মহিষীদের সঙ্গে বেশ প্রাণখোলা মনে আলাপ করতে লাগলেন। এমন সময় ধরিত্রী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দ্বারপালেরা ধরিত্রীকে দেখেই চিনতে পারলেন। তারা তাঁকে রাজার কাছে যাবার জন্যে পথ করে দিলেন।

রাজা তাঁকে দেখে বললেন, কি খবর ধরিত্রী? আজ তোমাকে বেশ আনন্দিত দেখছি যে।

রাজার কাছ থেকে মধুর সম্বোধন পেয়ে মুগ্ধ হলেন ধরিত্রী। তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে রাজন! আপনি ক্ষণিকের জন্যে অন্তরালে চলুন। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রাজা ধরিত্রীর কথা শুনে বললেন, কি এমন খবর তোমার আছে? আমার কাছে প্রকাশ্যে বলো। আমি শুনতে রাজী আছি।

ধরিত্রী বললেন, প্রকাশ্যে সেকথা বলা যাবে না বলেই আমি আপনাকে অন্তরালে যাবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছি।

এবার রাজা মহিষীদের কাছ থেকে ক্ষণিকের জন্যে বিদায় চেয়ে পৃথিবীর সঙ্গে এলেন এক নির্জন স্থানে। সেই স্থানটি হচ্ছে একটি পুষ্পবন। সেখানে এমন নির্জনতা বিরাজ করছে যাতে গাছ থেকে একটি ছোট পাতা পড়লেও তার শব্দ কানে আসে।

রাজা সেখানে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন ধরিত্রীর কথা। ধরিত্রী বললে, আমি গতকাল মধ্যরাতে এক সর্বগুণযুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করেছি। কোথায় জানেন? আপনার সেই যজ্ঞস্থলে।

রাজা জনক ধরিত্রীর কথা শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, চলো, আমি তোমার পুত্রকে যজ্ঞস্থলে দেখে আসি।

ধরিত্রী বললেন, চলুন।

এই বলে ধরিত্রী অদৃশ্য হলেন। তিনি রাজার সঙ্গে যজ্ঞস্থলে গেলেন না। রাজা একাই গেলেন যজ্ঞস্থলে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, এক অপূবসুন্দর শিশুসন্তান যজ্ঞস্থলে শুয়ে আপন মনে ক্রীড়া করছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। তাকে দেখতে যেন মূর্তিমান কার্তিক। সেইসঙ্গে সে কান্নাও সুরু করে দিয়েছে। মহাদ্যুতি সেই বালক কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে যজ্ঞভূমি হতে কিছুদূর পর্য্যন্ত গেল। যজ্ঞভূমি হতে বেরিয়ে একটি মৃত মানুষের মাথায় নিজের মাথা বিন্যস্ত করে কাঁদতে কাঁদতে কিছু সময় সেইভাবেই অবস্থিত হলো।

ওদিকে রাজা জনক পৃথিবীপুত্রকে অন্বেষণ করতে করতে এসে পৌঁছলেন যজ্ঞভূমি হতে প্রান্তভূমিতে। এসে দেখলেন জ্বলন্ত অগ্নির মত একটি শিশু শুয়ে আছে। তার সুন্দর রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর মনে পড়লো পূর্বেকার স্মৃতি। তিনি মাতা ধরিত্রীকে বলেছিলেন, বাল্যকালে তাঁর পুত্রকে দেখবেন। এখন রাজা জনক ধরিত্রীর পুত্রসন্তানটিকে কোলের মধ্যে নিয়ে নিলেন। পুত্রটিকে কোলে তোলার সময় তিনি দেখলেন তার মাথাটি স্পর্শ করে আছে একটি মানুষের শিশুর মাথাকে।

প্রাসাদে ফিরে এসে রাজা কুলপুরোহিত গৌতমকে জানালেন ঐ কথা। তারপর তিনি প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। সেখানে মহিষীদের সঙ্গে দেখা করলেন। সুমতি নামে একজন মহিষীর হাতে ধরিত্রীর পুত্রটিকে অর্পণ করলেন।

রাজমহিষী আনন্দিত হলেন ধরিত্রীপুত্রের অপূর্ব গুণরাশি

প্রত্যক্ষ করে। তিনি রাজর্ষিকে জানালেন, এ সন্তানটিকে কি আপনার সন্তুষ্টির জন্য লালন-পালন করবো ?

মহিষীর কথা শুনে রাজা জনক বললেন, সুন্দরী ! যজ্ঞভূমিতে উৎপন্ন এই বালককে নিজের সন্তানের মত লালন-পালন করো।

এরপর রাজর্ষি জনক মহিষীর কাছে বললেন সেইসব বৃত্তান্ত যা তিনি আগে শুনেছেন ধরিত্রীর কাছে। তিনি এও বললেন যে ধরিত্রী তাঁর বংশের সন্তান-সন্ততিদের দেখাশুনা করবেন।

ধরিত্রীর সুন্দর ও সুরূপ পুত্রের মুখদর্শনে বেশ আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন রাজমহিষী। তিনি ভাবলেন, এই পুত্র হতে তাঁর বংশের উন্নতি হবে। কেননা এই পুত্রের মধ্যে অনেক সুলক্ষণ ও গুণ বর্তমান রয়েছে।

ধরিত্রীর পুত্র নবক রাজা জনকের রাজপ্রাসাদে দিন দিন শশীকলার মত বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে রাজা জনক মহর্ষি গৌতমের সাহায্যে পুত্রের মনুষ্যাচরণীয় সংস্কার করলেন। মানুষের মাথার সঙ্গে ও মাথা যুক্ত করেছিল বলে পুত্রের নাম রাখা হলো নরক। ঋক্, যজু, সাম মন্ত্রের দ্বারা কেশ বপনাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় বিধিমতে করলেন।

ক্রমে নরক রাজপুরীতে শারদীয় চন্দ্রের মত শোভা পেতে লাগলো। রাজা তাকে মানুষের মত শিক্ষা দেবার জন্যে ঋষি গৌতমের পুত্র শতানন্দকে নিযুক্ত করলেন। শতানন্দের সঙ্গে দেবী বসুন্ধরাও শিক্ষা দিতে লাগলেন নরককে। নরক যখন জন্মগ্রহণ করে সেই সময় পৃথিবী কাত্যায়না নামে ধাত্রীরূপে নরককে দেখাশোনা এবং সেবাশুশ্রুষার জন্যে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং ষোলবছর কাল নরকের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে নজর রাখতে লাগলেন।

বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলো নরক। তার গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন কি এও দেখা গেল যে রাজা জনকের অন্যান্য পুত্রদের তুলনায় নরক অধিক গুণবান হয়ে উঠেছে। তাই দেখে রাজা জনক এদিকে যেমন আনন্দ প্রকাশ করলেন তেমনি অন্যদিকে দুঃখিত হলেন। তাঁর দুঃখের কারণ হলো, তিনি ভাবলেন তাঁব নিজের পুত্রদের তুলনায় ধরিত্রীপুত্র নরক যেভাবে উন্নততর রণবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠছে তাতে করে তাঁর রাজত্ব হয়ে যাবে হাতছাড়া। কালে পৃথিবীপুত্র নরকই হবে বিদেহরাজ্যেব অধীশ্বর। এই আশঙ্কা মনে মনে পোষণ করতেন রাজা জনক।

পৃথিবী রাজা জনকের আশঙ্কার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজমহিষী বুঝতে পারেননি।

রাজাকে বিমর্ষ এবং নিরানন্দ থাকতে দেখে একদিন রাজ-মহিষী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, নাথ! আজ আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করবো। আমি বেশ ক'দিন ধরে চিন্তা করছি, আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু সমর্থ হচ্ছি না আজ আমি সাহস নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে অনুমতি দান করুন।

রাজা জনক মন দিয়ে শুনলেন মহিষীর কথোপকথন। তিনি নম্রভাষায় বললেন, হ্যাঁ তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারো।

পতির কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে রাজমহিষী বললেন আচ্ছা নাথ! আগে আপনি নরককে কত স্নেহ করতেন। নিজের পুত্রদের অপেক্ষা নরককে অতিশয় সুন্দর দৃষ্টিতে দেখাশুনা করতেন। আপনার সামনে যখন নরক এবং আপনার অন্যান্য পুত্রগণ আসতো তখন আপনি নিজের পুত্রদের দিকে না তাকিয়ে নরকের দিকে আগে তাকাতেন এবং তার সঙ্গে কথা-বার্তা বলতেন। কিন্তু ইদানীংকালে আপনাকে একটু অন্যরকম

দেখছি কেন? এখন আপনার মনোভাব ঠিক বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন আপনি নরকের উপস্থিতি সহ্য করতে পারেন না। নরকের প্রতি আপনি উদাসীন ভাব দেখান। এখন নিজের পুত্রেরাই আপনার কাছে সব চেয়ের প্রিয় বলে বোধ হয়। কেবল তাই নয় নরককে দেখলে আপনি অমনধারা বিস্মিতভাবে কথাবার্তা বলেন কেন? আপনার ভাবদর্শনে সংশয় ও ভয় আমাকে পরিত্যাগ করছে না। আপনার পালিতপুত্র নরক অত্যন্ত রূপবান ও বীর্য্যবান। নীতি ও বিনয়ে সুপণ্ডিত এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ও মহাবলবান। আপনি এরূপ পরদুজ্জেয় পুত্রকে তেমনভাবে স্নেহ করতে পরাম্মুখ কেন? সেই কথা আমি জানতে ইচ্ছা করি। যদি বক্তব্য হয় তবে বলুন।

রাজমহিষীর কথা শুনে জনক বললেন, প্রিয়ে! তুমি যা জানতে চাইছ তা আমি বলবো। তবে এখন নয়। এর জন্যে তোমাকে তিনমাস অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমি প্রকৃত ঘটনা তোমাকে জানাবো।

রাজার কথা শুনে কতকটা আশ্বস্ত হলেন রাজমহিষী। কিন্তু আগের তুলনায় তাঁর মনের কৌতূহল ও সংশয় বেড়ে গেল। ভাবলেন, আজ ঐকথা না প্রকাশ করে রাজা তিনমাস সময় চাইলেন কেন।

এদিকে রাজা যখন মহিষীর সংগে কথাবার্তা বলছিলেন তখন ধাত্রী বসুন্ধরা অন্তরালে থেকে তাঁদের কথা শুনতে পেলেন। শুনে তিনি বেশ দুঃখিত হলেন। তারপর তিনি বিমর্ষচিত্তে রাজার কথা স্মরণ করলেন। তিনমাস অতীত হলে নরকের ষোড়শ বছর পূর্ণ হবে। তারপর রাজা মহিষীকে পুত্রগত জন্মবৃত্তান্ত সঙ্গোপনে বলবেন। তারপর আমার রহস্যও প্রকাশ পাবে। আমি ধাত্রীরূপে রয়েছি রাজপ্রাসাদে।

এইরূপ ভেবে দেবী বসুন্ধরা পুত্রের জন্য বেশ চিন্তিতা হলেন। সেই সময়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অতঃপর এলো সেই শুভ সময়। একদিন দেবী বসুন্ধরা গৌতমসহ রাজা জনককে অবস্থান করতে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আমার প্রস্তাবিত নিয়ম আপনি রক্ষা করে চলেছেন। সেইসঙ্গে আমার বিনয়াবনত পুত্রকেও আপনি সম্পূর্ণ-ভাবে প্রতিপালন করছেন। পুত্রও যৌবনে পদার্পণ করেও অত্যন্ত বিনীত হয়েছে। আপনার অনুগ্রহে আমাব পুত্র সুখে বর্দ্ধিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে পুত্রকে পূবের নিয়মানুসরণ করাতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি নরককে যেতে অনুমতি করুন। হে রাজন! পুরোহিতেব সঙ্গে আপনি কিছু সময় প্রতীক্ষা করুন এবং দুখিত হবেন না। আমি নবককে নিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করি।

রাজা জনক ধরিত্রীর এই কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি ধরিত্রীকে কিছু বলতে যাবেন এমন সময় ধরিত্রী হলেন অদৃশ্য।

তখন রাজা পুরোহিত গৌতমের কাছে নিজের মতামত প্রকাশ করলেন। ধরিত্রী অলক্ষ্য থেকে শুনতে লাগলেন রাজার কথা। ধরিত্রী যা চাইছিলেন রাজা তাতে সম্মত হলেন। অতঃপর পুরোহিতের সঙ্গে রাজা প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে।

এরপর একসময়ে নরক-ধাত্রী বসুন্ধরা মায়াবলে মানুষের রূপ ধরে নির্জনে নবককে জানালেন, মহাবাহু নরক! তোমাব সঙ্গে আজ গঙ্গায় যাবার ইচ্ছা করি। পুত্র! যদি তুমি অনুগমন করো তাহলে সুখে যেতে পারি।

নরক বললে, পিতার আদেশ ছাড়া আপনার সঙ্গে যেতে রাজী নই। মহারাজার অনুমতি নিয়ে আপনার ঈপ্সিত কাজ শেষ করবো আর গুরুপুত্র শতানন্দের অনুমতি নিয়ে রথে আরোহণ করে আপনার সঙ্গে যাবো গঙ্গাতীবে।

পুত্রের এইপ্রকার কথায় বিস্মিত হলেন ধাত্রীরূপিনী বসুন্ধরা। তাঁর মনে দুঃখ ও ক্ষোভ একত্র মিলিত হয়ে বহিঃপ্রকাশ হলো। তিনি বেশ কঠোর ভাষায় বলতে লাগলেন প্রিয়তম পুত্রকে উদ্দেশ্য করে,

মিথিলাপতি জনক তোমার পিতা নন। উনি তোমার প্রতিপালক পিতা। যে মহাত্মা তোমার পিতা আমার সঙ্গে গঙ্গার তীরে গেলেই তাঁকে দেখতে পাবে। যিনি তোমার জন্মদাতা, তাঁকে অচিরাৎ দেখতে পাবে। অন্যান্য গোপনীয় বিষয় গঙ্গাতীরে তোমাকে বলবো। না হলে গোপনীয় বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হবে।

ধাত্রীরূপিনী বসুন্ধরার কথা শুনলে নরক। রথ ত্যাগ করে সে পায়ে হেঁটে ধাত্রীর সঙ্গে এলো গঙ্গাতীরে। সুন্দর এবং সুমনোহর পরিবেশ। প্রকৃতি তার অকৃপণ হাতে শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে চতুর্দ্দিকে। সামনে বয়ে চলেছে পতিতপাবনী গঙ্গা কুলকুল নিনাদে।

ধাত্রী ধরিত্রী পুত্রকে অদূরে রেখে স্পর্শ করলেন গঙ্গামৃত্তিকা। অতঃপর তিনি প্রকাশ করলেন নিজের রূপ।

নরক সামনেব দিকে তাকিয়ে দেখলে, ধাত্রী বসুন্ধরা আর সেখানে সেই মূর্তিতে উপস্থিত নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন নীলোৎপলদলেব মত শ্যাম সর্বসুলক্ষণসম্পন্না সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মনোহর বিবিধ অলঙ্কার ভূষিতা এক দেবীমূর্তি।

পুত্র নরককে নিজের আসল রূপ দেখিয়ে বললেন, পুত্র! আমি কেন এই রূপ গোপন কবেছি জানো? এ কেবল তোমারই জন্যে। তোমাকে মানুষ করার জন্যে আমি ধাত্রীরূপে রাজা জনকের প্রাসাদে এতদিন পর্য্যন্ত বাস করে আসছি।

নরক বললে, আমার পিতা কে?

বসুন্ধরা বললেন, তোমার পিতা হচ্ছেন জগৎপতি বিষ্ণু। তিনি একসময়ে বরাহমূর্তিতে আমার সঙ্গে মিলিত হন। তার ফলস্বরূপ তুমি জন্মগ্রহণ করেছ আমার গর্ভে।

এরপর বসুন্ধরা নরকের সমস্ত জন্মবৃত্তান্ত একের পব এক প্রকাশ করলেন পুত্রের কাছে।

কিন্তু নরক কিছুতেই জননীর কথা বিশ্বাস করতে চাইলে না। তার মন হতে সংশয় দূর হলো না। সে একসময়ে সতেজে বলে

উঠলো, যদি আমার পিতা নিজে বিষ্ণু এবং আপনি স্বয়ং পৃথিবী মাতা তাহলে পিতা বিষ্ণু আমার উন্নতির জন্যে পৃথিবীতে আসুন এবং সেই সর্বলোকেশ্বর বিষ্ণু যদি বলেন যে আমি তোমার পিতা ও বসুন্ধরা তোমার মাতা তাহলে আমি বিশ্বাস করতে পারি। আপনি মানুষ রূপ ধারণ করে ধাত্রীরূপে আমাকে প্রতিপালন করেছেন। কিন্তু যদি আপনার এইপ্রকার রূপ হয় তাহলে সেই কাত্যায়নী রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

পুত্রের মনে বিশ্বাস জাগাবার জন্যে ধরিত্রী এবার জোরের সঙ্গে বলতে লাগলেন, পুত্র! আমি তোমার জননী। তুমি আমার দেহ হতে জন্ম নিয়েছ। আমিই জগদ্ধাত্রী পৃথিবী। আমারই স্বরূপ মৃত্তিকা। হে মহাবাহু! তোমার পিতা জগৎপালন ও অচ্যুৎরূপ বিষ্ণু। তাঁর বরাহ অবতারে তিনি আমার সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর ঔরসে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ।

ধরিত্রীর কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে না নরক। সে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করলে নিজের মনোভাব, আমার মাতা আগেই স্থির হয়েছেন কিন্তু আপনি বলছেন, আমি তোমার মাতা আর আমার পিতা আগেই নিহিত হয়েছেন। আপনি বলছেন বিষ্ণু তোমার পিতা। কিন্তু আমি জানি বিদেহাধিপতি রাজা জনক আমার পিতা। তাঁর মহিষী সুমতি আমার মাতা। তাঁর পুত্রগণ আমার ভ্রাতা ও জনকনন্দিনী সীতা আমার ভগিনী। একথা সকলেই জানে যে আপনি কিছুদিনের জন্যে কাত্যায়নী রূপ ধারণ করেছিলেন। সেই কাত্যায়নীই আমার ধাত্রী। কিন্তু আপনি যে পিতা ও মাতার কথা বলেছেন তা সবই মিথ্যে কল্পনা করেছেন। যে রূপেতে আমি আপনার পুত্র সে বিষয় নিশ্চিতভাবে আমাকে। বলুন।

পুত্রের কথা শুনে ক্ষণিকের জন্য বিষণ্ণা হলেন পৃথিবী। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন পুত্রের কাছে তার জন্মবৃত্তান্ত।

পুনরায় সেই একই কাহিনী বলতে লাগলেন নরকের কাছে। যেরূপে ঋতুমতী হয়ে বরাহরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্ভোগ হয়েছিল, যে কারণে দৈব-দুর্বিপাকে পুত্রকে গর্ভেই বহুদিন ধারণ করেছিলেন, যেরূপ গর্ভযন্ত্রনায় পীড়িতা হয়ে বিষ্ণুর শবণাপন্না হয়েছিলেন এবং যেরূপে জনকরাজাকে বিষ্ণু তাঁর প্রস্তাবিত নিয়ম প্রতিপালন করতে অনুমতি করেছিলেন সে সব বৃত্তান্ত প্রকাশ কবলেন পুত্রের কাছে।

মন দিয়ে শুনলো নরক সেসব কথা। কিন্তু তবু তার মন হতে সন্দেহ দূর হলো না।

এবার বসুমতী আগেকার সেই ধাত্রী কাত্যায়নীর রূপ ধারণ করলেন এবং নরকেব কাছে বললেন, আমি এই রূপে রাজা জনকের প্রাসাদে অবস্থান কবেছিলুম। তোমাব লালন-পালনের ভার পড়েছিল আমার ওপর। তুমি জনকবাজার প্রাসাদে এই অবস্থায় আমাকে নিত্য প্রত্যক্ষ কবতে। এবাব তো তোমাব বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথা।

মাতার কথা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলো নরক। তবু তার মন হতে সন্দেহভাব পূর্ণভাবে তিরোহিত হলো না।

বসুমতী পুনরায় নিজের রূপে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর মধ্যে পূর্বেকার কাত্যায়নী রূপ আব বইলো না।

নরক কাত্যায়নী রূপের কথা মনে মনে চিন্তা করে খানিকটা সুস্থির হলো। সে ভাবলে, হ্যাঁ, মায়ের এই কাত্যায়নী রূপ আমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি বাজা জনকের প্রাসাদে অবস্থানের সময়। অনেকবার কাত্যায়নী দেবী আমার কাছে আসতেন। দিনের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সময় তিনি আমাব কাছাকাছি থাকতেন। বিশেষ করে আমি যখন ধনুর্বিদ্যা শিখতুম তখন উনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তা প্রত্যক্ষ করতেন। আমি কিভাবে ধনুতে জ্যা আরোপ করে শর নিক্ষেপ করতুম তা অপলক নেত্রে দেখতেন কাত্যায়নী দেবী। দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন। আর একসময় তিনি

আমার অপরূপ এক লীলা দেখে আনন্দিত হতেন। আমি ভবন শিখীদের সঙ্গে যখন খেলায় রত হতুম তখন ঐ কাত্যায়নী দেবী আমার সামনে অবস্থান করে সেই খেলা প্রত্যক্ষ করতেন এবং অভাবিত কৌতুকের আড়ালে নিজের সত্তা গোপন করে রাখতেন। আমি তাঁর মনের অবস্থা যে বুঝতুম না এমন নয়। বুঝতে পারতুম, উনি আমার এসব খেলায় বেশী কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করেন অন্যান্য খেলার তুলনায়। খেলার মাঝে মাঝে ভবন শিখীদের সামনে যখন আহার্য্য দ্রব্য তুলে ধরতুম তখন তারা পেখম তুলে আনন্দে নৃত্য করতো আর কেকারবে দিকবিদিক মুখর করে তুলতো।

পুত্র নরক এভাবে ভেবে চলেছে। বসুমতী বেশ ভালভাবে পুত্রের অন্তরভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন। ভাবলেন, পুত্রের মনের কোণে এখনো পর্য্যন্ত জমা রয়েছে সন্দেহের অন্ধকার। ঐ অন্ধকার দূর করা আবশ্যক। কিন্তু কিভাবে তিনি তা দূর করবেন? জগৎপতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। তিনিই জীবের অগতির গতি। তিনিই শুভবুদ্ধিদাতা। তাঁর কৃপাতেই সবকিছু সম্ভব হয়।

এইরূপ চিন্তা করে মাতা বসুমতী কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা নিবেদন করলেন জগৎস্বামী নারায়ণের কাছে। তিনি বললেন, হে জগৎস্বামী! আপনি অন্তর্যামী। আপনি আমার অন্তরের কথা সম্যকভাবে অবহিত আছেন। বর্তমানে আমি পুত্র নরককে নিয়ে বড় অসুবিধায় পতিত হয়েছি। সে আমাকে কিছুতেই জননী বলে মানতে চাইছে না। সেই সঙ্গে আপনাকেও পিতারূপে স্বীকার করতে নারাজ। এই অবস্থায় আমি ভীষণ সঙ্কটে পড়েছি। হে সঙ্কটত্রাতা মধুসূদন! আপনি সত্বর এসে আমার এই সঙ্কট দূর করুন।

মাতা ধরিত্রীর কাতর প্রার্থনায় বিগলিত হলো বিষ্ণুর চিত্ত। তিনি বৈকুণ্ঠে আর স্থির থাকতে পারলেন না। চলে এলেন

পুত্র নরক মায়ের আদেশমত প্রণাম জানালেন বিষ্ণুকে। অতঃপর বিষ্ণুর অঙ্গ হতে জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্গত হয়ে চতুর্দিক ভেসে যেতে লাগলো। সেই জ্যোতিতে স্নান করে শান্ত হলেন বসুমতী। আর সেইসঙ্গে সুস্থির হলো পৃথিবীসূত নরক।

এরপর নরক একটি পৃথক আসনে উপবেশন করলে। নরক সুস্থির হয়ে উপবেশন করলে মাতা ধরিত্রী পুত্রের জন্যে নারায়ণের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তিনি বললেন, হে করুণাঘন স্বামী! আপনি পুত্র নরকের প্রতি প্রসন্ন হোন। ওর মনে বিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করুন যাতে ও আমাদের সত্যভাবে জানতে পারে। আমরা যে ওর জনক-জননী এ-কথা যেন সে সত্যভাবে বুঝতে পারে। আপনি বিপদতারণ মধুসূদন! আপনি কৃপা করে আমাকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করুন। কেননা পুত্র নরকের মন এখনো পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন। ওর মনে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমরা জনক-জননী। আপনার শক্তি আসাধারণ। আপনি নরকের মধ্যে সেই দিব্যশক্তি সঞ্চার করুন যাতে করে ওর মনে ঠিক ঠিক বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

এইভাবে ধরিত্রী দেবাদিদেব বিষ্ণুর কাছে একান্তমনে প্রার্থনা জানালেন।

ধরিত্রীর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু সামান্য হাসলেন। তারপর নিজের এক হাত নরকের শিরে স্পর্শ করলেন। সেই হাতে শোভা পাচ্ছে শঙ্খ। তার দিব্য স্পর্শ লাভ করে সন্তুষ্ট হলো নরক। তার মুখমণ্ডল অপরূপ আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত

হয়ে উঠলো। ক্রমে তার অন্তরে ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাতে আরম্ভ হলো। এখন থেকে ধরিণীকে নিজের মাতা এবং বিষ্ণুকে পিতা বলে ভাবতে লাগলো।

এরপর ধরিত্রী বিষ্ণুকে বললেন, নাথ! আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে পূর্বের কথা। আপনি প্রসন্ন হয়ে পূর্বপ্রতিজ্ঞা পালন করুন। আপনি আমাকে এই পুত্র প্রদান করার সময় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পালন করুন।

ধরিত্রীর প্রার্থনা শুনে সদাহাস্যময় বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন, ধরিত্রী, তুমি বৃথা চিন্তা কোরো না। আমি পূর্ব প্রতিজ্ঞামত তোমার পুত্রকে সর্বকিছু দিয়েছি। এমন কি তার ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সুখের হয় তার জন্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তাকে রাজত্ব দিয়েছি।

বিষ্ণুর কথা শুনে আনন্দিত হলেন ধরিত্রী। তাঁকে বারংবার নমস্কার জানালেন।

তথাপি তাঁর মনের অতল তলে সামান্য অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। তিনি ভাবলেন, বিষ্ণু তো অনেক ভাল কথা বললেন এখন কাজে তা প্রকাশ হলে ভাল হয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে কি সত্যিই নরকের জন্যে রাজত্ব দিয়েছেন?

আবার পরক্ষণে ভাবলেন ধরিত্রী, তা হলেও হতে পারে। এযাবৎ বিষ্ণুর প্রতিটি কথা সত্য হয়েছে আর বাকী অর্থাৎ শেষ কথাটি কি করে সত্য না হয়ে পারে।

এমনিভাবের চিন্তা মনের মধ্যে উঠছে পড়ছে মাতা ধরিত্রীর। অন্তর্যামী বিষ্ণু তা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, কি ধরিত্রী, আমার কথা তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা তুমি ও নরক আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে।

মাতা ধরিত্রী রাজী হয়ে গেলেন বিষ্ণুর কথা শুনে। তখন

বিষ্ণু যাত্রা করলেন ধরিত্রী ও নরককে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে গঙ্গাপথে যাত্রা আরম্ভ করলেন। তারপর নানাপথ অতিক্রম করে শেষকালে এসে পৌঁছলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্তমান গৌহাটি)। সেই সময় ওখানে কিরাত নামে এক দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি বাস করতো। তাদের গায়ের রং ছিল স্বর্ণাভ। আকারেও দৈত্যসম। তারা বীরবিক্রমে বাধা দিতে এলো নরক এবং নারায়ণকে। স্বয়ং নারায়ণ কৌশলে কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি নরককে বললেন, পুত্র, তুমি কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

নরকের সঙ্গে উত্তম উত্তম অস্ত্র ছিল। ওদিকে কিরাতদের যে নেতা তার নাম ঘটক। সে নরকের বিরুদ্ধে চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। উভয়পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তুমুল যুদ্ধ হলো।

নরকের শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে অনেক কিরাত সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হলো, অনেকে বা অন্যত্র পলায়ন করলে।

এমনিভাবে নরক কর্তৃক কিরাত সৈন্যগণ এবং তাদের সেনাপতি ঘটক নিহত হলে নরক চলে এলো বিষ্ণুর কাছে। এসে বললে তাত! কিরাতরাজ ঘটক হত হয়েছে। এখন কি করতে হবে তা একবার বলুন।

ভগবান বললেন, পুত্র, দেবী দিবাকর-বাসিনী স্থান পর্যন্ত কিরাতদের অপসারিত করো এবং পলাতকদের শাস্তি প্রদান করে শরণাগতদের রক্ষা করো। ভগবানের কথা শিরোধার্য করে কাজ আরম্ভ করে দিলে নরক। কিরাতদের বেগশালী শ্বেত হস্তীর পিঠে আরোহণ করে নরক দিবাকর-বাসিনী স্থান পর্যন্ত কিরাতগণকে অপসারিত করলে।

এরপর নরক কিরাতদের বিতাড়ন করে পুনরায় পিতার কাছে এসে এই কথা বললে, কিরাতগণ আমার প্রভাবে তাড়িত হয়ে সাগরের কাছাকাছি আশ্রয় নিয়েছে। কিরাতদের রাজা ঘটকও

নিহত হয়েছে। এখন অন্য কি কাজ আছে তা আদেশ করুন। আমি তাহলে ঐরাবত তুল্য কিরাতরাজার এই শ্বেতহস্তীর পিঠে আরোহণ করে সেই কাজ করতে যত্নপরায়ণ হবো। আমি আপনার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছি।

নরকের কথা শুনে ভগবান বললেন, পুত্র, করতোয়া নামে গঙ্গা সর্বদা পূর্বদিকে বয়ে চলেছে। যেখানে ললিতকান্তা দেবী আছেন সেইস্থান পর্যন্ত তোমার গৃহ হবে। এখানে দেবী মহামায়া জগৎ প্রসবিনী যোগনিদ্রা কামাখ্যারূপ ধারণ করে সর্বদা বিরাজ করছেন এবং ব্রহ্মপুত্র নামে নদও কুলকুল নিনাদে বয়ে চলেছে। এখানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি সবদা অবস্থান করি এবং সূর্যও নিরন্তর বাস করছেন। এটি অতীব রহস্যস্থান। এই কারণে এখানে সকল দেবতা লীলাচ্ছলে এসে থাকেন। এখানে রয়েছেন সর্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী। এইস্থান অতিশয় গোপনীয় এবং ভোগ্যভূমি। এই পুরীতে আগে ব্রহ্মা একটি নক্ষত্র পরিত্যাগ করেছিলেন। সেইকারণে ইন্দ্রপুরীতুল্য এই পুরীর প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম হলো। ভদ্র নরক! তুমি দার পরিগ্রহ করে রাজা হয়ে অমাত্যের সঙ্গে কুশলে বাস করো। আমি তোমাকে অভিষিক্ত করলুম।

এই কথা বলে বিষ্ণু মহাদেবের পরামর্শমত পূর্বসাগরের কাছে ভূমিতে তাদের থাকার জায়গা নির্ণয় করলেন। রাজা নরক এবং অমাত্যগণ মহাসুখে দেবী কামাখ্যার সঙ্গে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বাস করতে লাগলেন। বিষ্ণুর চেষ্টায় একদল বেদপারঙ্গম ব্রাহ্মণ এসে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বসবাস করতে শুরু করলেন। বিষ্ণুর অভিপ্রায় ছিল ব্রাহ্মণদের দ্বারা ঐ অঞ্চলে বেদবিধি প্রসারলাভ করবে। কার্যত তাই হলো। ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিত্য বেদবিধি শ্রদ্ধা সহকারে পালিত হচ্ছে দেখে দেবতারা কামরূপ ত্যাগ করে অধিকক্ষণ অন্যত্র থাকতে পারতেন না। তাঁরা ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকলাপ অধিকভাবে পছন্দ করতে লাগলেন এবং তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রীত হলেন।

এভাবে বেশ আনন্দের মাঝে দিনগুলি কাটতে লাগলো রাজা নরকের। জগৎপতি বিষ্ণু দেখলেন, এবার নরকের বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক দেখাশোনার পর রাজা জনকের কন্যা মায়ার সঙ্গে নরকের বিবাহপ্রস্তাব একরকম স্থির হয়ে গেল।

নরক নিজে থেকেই ঐ বিবাহে রাজী হয়ে গেল। কেননা সে যখন রাজা জনকের প্রাসাদে ছিল তখন থেকে মায়ার সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়-সখ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ক্রমে সেই সখ্যতাতরু কিশলয় হতে বিরাট বনস্পতিতে রূপান্তরিত হলো। নবক যখন রাজা জনকের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে আসে তখন সেই আবাল্য সহচরী মায়ার দু'নয়ন বিরহবেদনার অশ্রুতে সজল হয়ে উঠলো। নরক তার সেই মায়ার হাতছানি ভুলতে পারেনি অনেকদিন। মনে মনে সে মায়াকে চিরসঙ্গিনী করতে ইচ্ছা করেছিল। আজ এতদিনে তা সম্ভব হলো অন্তর্যামী বিষ্ণুর সহযোগিতায়। তিনি হয়তো যোগবলে বুঝতে পেরেছিলেন মায়াব অব্যক্ত মনের অভিলাষ। আর সেই অভিলাষ পূরণ করবার জন্যে মায়ার সঙ্গে বিয়ে দিলেন নরকের। বিয়ের পর নরকের সঙ্গে মায়াকে সিংহাসনে বসিয়ে অভিষেক করলেন। তারপর রাজা নরকের জন্যে গড়ে তুললেন সুন্দর এক সুরক্ষিত পুরী পার্বত্য নিরাপদ পরিবেশে। কিরাত রাজা ঘটককে বধ করে তার রথসহ প্রচুর ধনরত্ন ও অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিষপত্র হস্তগত করেন জগৎপতি বিষ্ণু। সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পুত্র নরককে দান করে বললেন, হে নরক! তুমি ঐশ্বর্য গ্রহণ করে সুখে রাজত্ব করো। কিরাতগণ, উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও মুনিগণ তোমার প্রজা। তুমি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কোরো। বিশেষ করে তোমার মন যেন দেব-দ্বিজ-মুনিদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়ে ওঠে। নচেৎ তোমার রাজ্যে দেখা দেবে অমঙ্গল। বিশেষ করে তুমি যদি মুনিদের প্রতি [illegible] হও তাহলে তোমার মনে থাকবে না শান্তি। কারণ

তাঁরা হচ্ছেন বেদজ্ঞ। তাঁরা শুদ্ধাচারে বেদের আচার পালন করে থাকেন। তাঁদের অবমাননা করলে তোমার কল্যাণ হবে বলে আমি মনে করি না।

এরপর মহামতি বিষ্ণু রাজা নরককে আর একটি অতি গুহ্য বাক্য বললেন। তিনি বললেন, এই প্রাগ্‌জ্যোতিগপুর ধন্য হয়েছে দেবী কামাখ্যার জন্যে। উনিই তোমার একমাত্র ইষ্টদেবী। তুমি ওঁর রূপ মনে মনে ধ্যান করবে এবং শ্রদ্ধা সহকারে ওঁর অর্চনা করবে। তাহলেই তোমার কলাণ হবে। তোমার এই সুন্দরী এবং পরম গুণবতী স্ত্রী মায়া তোমার সঙ্গে নিত্য অবস্থান করুক এই কামনাই আমি করি। তুমি পুত্রের জন্যে ত্রেতাতে যত্ন করো, তারপর দ্বাপরের শেষভাগে পুত্র হবে। পরের অজেয় এই মহাদুর্গের মধ্যে সর্বদা বাস করো এবং তাতে দিব্য স্ত্রীদের সঙ্গে সুখভোগে রত থাকো। এভাবে থাকলে তুমি নিরন্তর সুখভোগ করবে। কিন্তু দেখবে একটা কথা স্মরণ রেখো, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মধ্যে বাস করেও কখনো ভুলে যেও না তোমার ইষ্টদেবী কামাখ্যাকে। তিনি তোমার শুভাকাঙ্খিনী এবং মঙ্গলদাত্রী।

নরককে এই কথা বলার পর জগৎপতি বিষ্ণু ধরিত্রীর কাছে এসে তাঁর কানে কানে বললেন, সুন্দরী! তোমার কাছে যে যে বিষয় আগে বলেছিলুম সে সবই নরকের আশু মঙ্গলের জন্যে। অতএব সে বিষয়ে তুমি ওকে উপদেশ দাও। জগদ্ধাত্রী! তুমি যে সময়ে নরককে বিনাশ করতে আমাকে বলবে সেই সময়ে কোন এক মানুষ তাকে বিনাশ করবে। অর্থাৎ নরক সুরভাবে থাকলে সুখী হবে আবার অসুরভাব ধারণ করলে ধ্বংস হবে।

পৃথিবী বললেন, পুত্রের জন্যেই আমার এই যত্ন কিন্তু পুত্রের অভাব হলে আমার নিন্দা হবে। অতএব নাথ! আপনি পুত্রকে প্রতিপালন করুন।

পৃথিবীর প্রার্থনা রক্ষা করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন বিষ্ণু। তিনি বললেন, তুমি যা বললে তাই করবো।

অতঃপর বিষ্ণু নরককে স্নেহবাক্য বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

রাজা নরকও স্ত্রী-জননীকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর শাসন কৌশল, অপরূপ বদান্যগুণ এবং দেবী কামাখ্যার প্রতি ভক্তি দিনের পর দিন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বাইরে অনেক স্থান হতে দলে দলে লোক এসে জমায়েত হতে লাগলো। সকলে রাজা নরকের গুণ দেখে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। তাই শুনে বিদেহাধিপতি রাজা জনক একদিন এলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। স্ত্রী-পুত্রও এলো তাঁর সঙ্গে। রাজা জনক জামাতা নরকের রাজ্য দেখে মুগ্ধ হলেন। স্ত্রী ও পুত্রকে দেখালেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অপরূপ শ্রী ও সম্পদ। তাঁরাও নরকরাজার রাজধানী দেখে মুগ্ধ হলো।

এরপর রাজা জনক মহিষীকে উদ্দেশ করে বললেন, রাজা নরক আমার পালিত পুত্র। ও আমার ঔরসজাত পুত্র নয়। বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে রাজা নরক। তবে আমার কাছে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছে বলে আমি ওকে অত্যধিক স্নেহ করি।

এই বলে জনক মহিষীর কাছে রাজা নরকাসুর প্রসঙ্গটি পূর্ণভাবে বিবৃত করলেন।

অতঃপর নরকাসুর জাঁকজমক করে আপ্যায়ন জানালেন রাজা জনককে। রাজা জনক জামাতার আন্তরিক আপ্যায়নে তৃপ্তিলাভ করে তাঁর গৃহে কিছুকাল অবস্থান করে ফিরে এলেন বিদেহ নগরীতে।

স্ত্রী মায়াকে নিয়ে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছেন রাজা নরক।

নিয়মিত যাগযজ্ঞ করতে লাগলেন। মুনিঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানালেন। দেবদ্বিজে ভক্তিও প্রকাশ পেতে লাগলো। কামাখ্যা-দেবীকে স্মরণ করে প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করেন। একদিন বুঝি দেবীকে স্মরণ না করে শয্যাত্যাগ করেছিলেন বলে সেদিনটা ভালভাবে কাটেনি। নানারকম অশান্তি অভিযোগ এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। তারপর তিনি কুলপুরোহিতকে আহ্বান করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে কুলপুরোহিত জবাব দিলেন, মহারাজ। আপনি প্রাতঃকালে দেবীকে স্মরণ করে শয্যাত্যাগ করেন কি?

রাজ নরক বললেন, হ্যাঁ, তাতো করে থাকি।

রাজপুরোহিত বললেন, আজ কী আপনি দেবীকে স্মরণ করে শয্যাত্যাগ করেছেন?

রাজা নরক এবার চিন্তা করতে লাগলেন সকাল বেলাকার তাঁর করণীয় কর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে। খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বললেন, না, মনে হচ্ছে আজ যেন মাকে স্মরণ না করে শয্যা থেকে উঠেছি।

রাজপুরোহিত এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, বুঝেছি আপনি কেন আজ এত অশান্তি ভোগ করছেন। আপনি আপনার ইষ্টদেবীকে আজ স্মরণ করতে ভুলে গেছেন বলে এমনটি ঘটেছে।

রাজা নরক বললেন, কি উপায় হবে রাজপুরোহিত?

রাজ-পুরোহিত জবাব দিলেন, দেবী বর্তমানে আপনার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। দেবীর তুষ্টির জন্য একদিন আপনাকে উপবাস করে দেবীর নাম জপ করতে হবে প্রাতঃকাল হতে আরম্ভ করে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত। তাহলেই দেবী আপনার প্রতি তুষ্ট হবেন।

রাজপুরোহিতের কথামত রাজা নরক সেই মত অনুষ্ঠান করলেন। একদিন অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা থেকে উঠে দেবীর নাম স্মরণ করতে করতে প্রাসাদ হতে বেরিয়ে সোজা চলে গেলেন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে

নদীর পুণ্যশীতল জলধারায় অবগাহন করে তিনি উঠে এলেন তীরে। তীরে বসে মায়ের নাম জপ করলেন কিছুক্ষণ। তারপর কামাখ্যা-মায়ের মন্দিরে বসে সারাদিন জপ করলেন।

এর ফলও পেলেন রাজা নরক। তারপর দিন থেকে তাঁর মন হতে সর্বপ্রকার অশান্তি এবং অমঙ্গলজনক ক্রিয়াকলাপ হওয়ার আশঙ্কা সমূলে বিদূরিত হয়ে গেল।

তিনি হলেন সুস্থির, শান্ত। তাঁর সকল কর্ম হতে লাগল বিঘ্নশূন্য।

আর একবাব বাজা নরক দেবী কামাখ্যাকে স্মরণ না করে মৃগয়া করতে যান।

লোকজনসহ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার জন্য তাঁবু খাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই তাঁবুর মধ্যে নিবাপদে অবস্থান করতে পারলেন না। এক একদিন এক একটা উৎপাত লেগেই রইলো। কোনদিন এলো বিষাক্ত সাপ, কোনদিন বা বিরাট বড় পিপঁড়ে, কোনদিন বন্য মহিষ, কোনদিন বাঘ। এসব বন্য জন্তুদের আক্রমণে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। আর তিনি এসবের মূলীভূত কারণ স্থির হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ভাবলেন, তাঁর ইষ্টদেবী কামাখ্যাকে স্মরণ করেন নি বলে হয়তো এমন অনর্থ ঘটছে তাই তিনি মাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ কবতে লাগলেন। এমন কি তীরধনুক নিয়ে যখন তিনি শিকারে যেতেন তখনও ইষ্টনাম জপ করতে করতে যেতেন। ফলে হলো কি, তাঁর জীবনে বন্যজন্তুর আক্রমণের ভয় আর রইলো না। তিনি নির্বিঘ্নে শিকারপর্ব সমাধা করে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করতেন।

রাজপ্রাসাদে অবস্থান করবার সময় রাজা নরক প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্রীয় আচার পালন করতেন। শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হতে শ্লোক আবৃত্তি করতেন :

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময়,
আবিরাবির্ম এধি,
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ।'

অর্থাৎ আমাদের অসৎ হতে সৎ-এ নিয়ে যাও, আমাদের তম হতে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, আমাদের মৃত্যু হতে অমরত্বে নিয়ে যাও, আমাদের কাছে আবির্ভূত হও, আমাদের কাছে এসো। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তার দ্বারা আমাদেব নিত্য রক্ষা করো।

রাজা নরকাসুর দেবী কামাখ্যার মন্দিরে বসে একান্ত মনে দেবীর ধ্যান করতেন। ধ্যানের পর যুক্ত করে দেবীর স্তোত্র পাঠ করতেন :

'জগৎপূজ্যে জগদ্বন্দ্যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিনি।
পূজাং গৃহাণ কৌমারি জগন্মাতর্নমোহস্তু তে ॥'......

স্তোত্র পাঠের পর দেবী কামাখ্যাকে নমস্কার জানিয়ে বলতেন :

'কামাখ্যে বরদে দেবি নীলপর্ব্বতবাসিনি।
ত্বং দেবি জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোহস্তুতে ॥'

প্রতিদিন সকালে রাজা নরক এই সমস্ত শাস্ত্রীয় পুণ্য শ্লোক আবৃত্তি করার পর দিনের কাজে হাত দিতেন। দিনের শেষে আবার তিনি মুনি-ঋষি এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নানারকম শাস্ত্রীয় আলোচনায় রত হতেন। এভাবে তিনি বেশ সুখে ও শান্তিতে অবস্থান করতে লাগলেন।

একদিন রাজপুরোহিত রাজা নরককে প্রশ্ন করলেন, হে মহারাজ। বিষ্ণু আপনাকে কেবল দেবী কামাখ্যার পূজা নিয়ে থাকতে বলেছেন। আপনি তা না করে অন্যান্য দেবতাদের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

উত্তরে রাজা নরক বললেন, রাজপুরোহিত। আপনার কথা

সত্য। আমি অন্যান্য দেবতাদের কথা ও কর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে মহিষীদের সঙ্গে আলোচনা করে থাকি। কিন্তু তাই বলে আমি দেবী কামাখ্যার প্রতি কখনো অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করি নি। মহিষীদের কাছে মাঝে মাঝে শুনি ঈশ্বর প্রসঙ্গ। অদ্বৈতবাদের প্রতি আমার ঝোঁক বেশী। আমি মূর্ত্তিপুজা পছন্দ কবি না। অবার দেবী কামাখ্যারও কোন মূর্ত্তি নেই। ঘটস্থাপনা করে মায়ের আরাধনার ব্যবস্থা করেছি মাত্র। আপনি আমাকে এই দোষে অভিযুক্ত করছেন যে আমি মহামায়া কামাখ্যাকে ভুলে গিয়ে অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে শুধু মাথা ঘামাই? আপনার এই অভিযোগ সত্য নয়। আমি বড় দুঃখিত আপনার মত পণ্ডিত মানুষের মুখে সাধারণ একজন কিরাতের মত কথা শুনে। আপনি বেশ ভালভাবেই জানেন যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি লীলার জন্যে এক থেকে বহু হয়েছেন। এই রূপ তাঁর ক্ষণিক। আজ আছে কাল নেই। সত্য এক ও অদ্বিতীয়। সেই সত্য হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ। তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। তাছাড়া আর যা কিছু তা সবই খণ্ড খণ্ড। তা হচ্ছে বিভিন্ন দেবতার প্রতীক। এক ঈশ্বর লীলার জন্যে সৃষ্টিকে বজায় রাখার কারণে জগন্মাতার রূপ গ্রহণ করেছেন। আসলে জগন্মাতা বলে আলাদা কোন দেবী বা দেবতা নেই। সেই এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই দেবী হয়েছেন। সুতরাং দেবী কামাখ্যা আর পরম ব্রহ্মের মধ্যে কোনরকম বৈসাদৃশ্য নেই। যারা তা করতে যায় তারা খণ্ড জ্ঞানের অধিকারী বলে আমি মনে করি।

রাজা নরকের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন রাজপুরোহিত। মনে মনে ভাবলেন, একজন অসুর হয়ে কিভাবে নরক দেবদেবীর প্রতি এমন শ্রদ্ধাপরায়ণ। সাধারণতঃ অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের একেবারে আদায়-কাঁচকলা। সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই আছে। দেবতারা সর্বদা চায় অসুররা যাতে স্বর্গ-মর্ত-পাতালের অধিকারী না হয়। কিন্তু অসুররা নিজেদের বাহুবলে দেবতাদের অনেকসময়

পরাস্ত করে। রাজা অসুর হয়েও আচরণে ও কর্মে প্রায় দেবতাতুল্য। জানিনা কতকাল সে এইভাব বজায় রাখতে পারবে।

রাজপুরোহিত বললেন, দেবী কামাখ্যা হচ্ছেন আছা শক্তির অংশ বিশেষ। সেই আছা শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যপে অবস্থান করছেন। তাঁর লীলারহস্য বোঝা ভার। তিনি আদি শক্তি। অনাদি কাল হতে তাঁর উপস্থিতি আমরা বোধ করে থাকি। সুতরাং তাঁকে আমরা আদৌ অবহেলা করতে পারি না।

রাজা নরক বললেন, আমি দেবী কামাখ্যাকে আদৌ অবহে করি না। মা যে শক্তিময়ী এবং তিনি জীবের অভ্যন্তরে বা..র অবস্থান করে তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন একথা একেবারে সত্য। আমি এও অনুভব করছি যে মায়ের শক্তিতে আমি শক্তিমান। আমার যাকিছু কীর্তি ও যশ তা সবই মায়ের জন্যে সম্ভব হচ্ছে।

রাজা নরকাসুরের কথা শুনে আনন্দিত হলেন রাজপুরোহিত। মনে মনে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন, মা, রাজা নরকাসুরকে ঠিক মত দেখিস্ মা। ও যেন নিজমূর্তি ধারণ না করে ওব মতিগতি যেন সুন্দর হয়, স্বাভাবিক হয়।

এরপর রাজপুরোহিত বিদায় নিলেন রাজা নরকাসুরের কাছ থেকে।

রাজপুরোহিত রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে এসেছেন। পথে এক পা বাড়িয়ে শুনতে পেলেন দু'জন নাগরিকের অদ্ভুত কথোপকথন। তারা রাজা নরককে উদ্দেশ্য করে বলাবলি করছে। প্রথম নাগরিক বললে, রাজা নরক একজন অসুর হয়ে ঠিক ব্রাহ্মণের মত আচরণ করছে। এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এরকম ঘটনা বড় একটা দেখা যায় না।

আর একজন নাগরিক বললে, ঠিক বলেছিস ভাই। আমারও তাই মত।

প্রথম নাগরিক বললে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে নরকাসুরের

প্রন্তি। তাই এরকম হয়েছে সে। তা নাহলে রাজা মগুপান করে না, নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর অঙ্গ স্পর্শ করে না। এ কি কম কথা।

দ্বিতীয় নাগরিক বললে, হ্যাঁ, সে একটা কথার কথা বটে। এ রকম তো হয় না।

রাজপুরোহিত ওদের কথা শুনে মনে মনে তৃপ্তি পেলেন। তিনি ওদের কিছু বললেন না। আপন মনে এগিয়ে চললেন নিজের আবাসের দিকে।

অনেকদিন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুবে গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করলেন রাজা নরকাসুর। ত্রেতাযুগ অতীত হলো। এলো দ্বাপর যুগ। সেও চলে যেতে লাগলো। দ্বাপব যুগের শেষ ভাগে শোণিতপুরে জন্মগ্রহণ করলেন বাণ নামে এক অসুব। বাণ হচ্ছেন বলির পুত্র।

তিনি দীর্ঘকাল শিবেব আরাধনা করে তাঁর প্রিয়পাত্র হন। কেবল প্রিয়পাত্র নন শিব একদিন তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। বাণ তাঁব চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানালে শিব বললেন, রাজা বাণ! আমি তোমার তপস্যায় অতীব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো।

শিবের কথা শুনে রাজা বাণ বললেন, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে এমন বর দিন যাতে করে আমি অজেয় হতে পারি। দেব-দানব থেকে আরম্ভ করে যক্ষ-রক্ষ কেউ আমাকে পরাভূত করতে পারবে না।

বাণের প্রার্থনা শুনে শিব তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, তথাস্তু। তুমি আমার বরে আজ হতে অজেয় হবে। তোমার বাহুতে নেমে আসবে অসুরসম বল।

এই কথা বলে শিব অদৃশ্য হলেন। এরপর হতে বাণ ক্রমশ

দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। ত্রিভুবনে তিনি কাউকে গ্রাহ্য করতেন না। আপনার খেয়াল-খুশীমত চলতে লাগলেন। তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী হলেন যে তাঁর কাছে দৈবশক্তিও অতিশয় তুচ্ছ ব্যাপার বলে বোধ হতে লাগলো। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে তিনি দেবতাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে লাগলেন।

ক্রমে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো রাজা নরকেব।

একদিন রাজা নরক মা কামাখ্যাকে পূজো করতে বসেছেন। সেই সময় রাজা বাণ এসে হাজির হলেন তাঁর প্রাসাদে। দ্বাররক্ষীদের কাছে প্রশ্ন কবে জানতে পাবলেন, এখন রাজা নবকেব সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না। তিনি এখন দেবী কামাখ্যাব অর্চ্চনায় ব্যস্ত। যদি তাঁব সঙ্গে দেখা করতে চান বাণ, তাহলে তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

দ্বাররক্ষীদেব কথা শুনে বিস্মিত হলেন বাজা বাণ। তাঁর মনে ক্রোধেব সঞ্চার হলো। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, কি তোমাদের এতদূর স্পর্দ্ধা। আমাকে অপমান কবো। আমি আর এখানে আসবো না। তোমাদেব রাজাকে বলে দিও, বাণ তাব ভৃত্য নয় যে তার কাছে এসে অযথা অপেক্ষা করবে।

এই কথার বলার পর রাজা বাণ বাগে গবগর করতে করতে নরকাসুরের প্রসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওদিকে মায়ের পূজো শেষ করে রাজা নরকাসুর যখন শুনলেন রাজা বাণ এসেছিলেন তাঁর প্রাসাদে এবং তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়ার জন্যে রাগ করে ফিরে গেছেন তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখুনি তিনি সিপাই-শান্ত্রীকে আদেশ করলেন, আমার জন্যে রথ প্রস্তুত করো। আমি এখুনি যাবো রাজা বাণের রাজপ্রাসাদে।

রাজা নরকাসুরের এমন কথা শুনে অবাক হলো সিপাই-শান্ত্রীরা। তারা ভাবলে, রাজা নরকাসুর তো এরকম আচরণ

কোনদিন দেখান নি। তিনি প্রতিদিন সকাল থেকে আরম্ভ করে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত মায়ের আরাধনা করেন। ঐ সময় তিনি এক কণা আহার্য্যদ্রব্যও গ্রহণ করেন না। মা কামাখ্যার পূজোর পর তবে তিনি অন্ন-জল স্পর্শ করেন। তার আগে আর নয়। তারপর ক্ষণিক বিশ্রাম নিয়ে রত হন অন্য কাজে। আজ কেন এমন ব্যতিক্রম হলো!

রাজা নরকাসুরের এই প্রকার খেয়ালের কথা কানে গেল পতিব্রতা স্ত্রী মায়াদেবীর। তিনি ছুটে চলে এলেন স্বামীর কাছে। তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন, নাথ! এই অভাগীকে দয়া করে জানান, কেন আজ আপনি এমনধারা আচরণ করছেন?

স্ত্রীর কথা শুনে রাজা নরকাসুর বললেন, এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নেই আমার। পথ ছাড়ো। এখন আমি যাবো রাজা বাণের বাড়ী।

এই বলে রাজা নরকাসুর ক্ষণিক অপেক্ষা না করে এবং স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে প্রস্থান করলেন।

পরে রথে আরোহণ করে চললেন বাণরাজার প্রাসাদ অভিমুখে।

সবেমাত্র প্রাসাদে ফিরেছেন রাজা বাণ। তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। প্রাসাদের বাইরে একটা প্রান্তরের মাঝখানে বসে মুক্ত বায়ু সেবনে রত হলেন রাজা বাণ। তিনি ভাবলেন, এভাবে মুক্তাঙ্গনে বসে মুক্ত বায়ু সেবন করলে নিশ্চয়েই তাঁর শরীর ভাল হয়ে উঠবে। ক্লান্তি দূর হবে শরীর হতে।

হঠাৎ দূরে শুনতে পেলেন অশ্বের পদশব্দ। ভাবলেন, কেউ নিশ্চয়ই আসছে অশ্বের পিঠে আরোহন করে। হয়তো কোন দূত হবে কোন রাজার।

রাজা বাণ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। উঠে দেখতে পেলেন অদূরে একটি রথ। ভালো করে তাকাতেই দেখতে পেলেন, রথটি

হচ্ছে রাজা নরকাসুরের। নরকাসুর নিজে বসে আছেন রথের ওপর। তাঁর মুখমণ্ডল মলিন—বিবর্ণ।

রথ ক্রমশঃ নিকটতর হতে লাগল। রাজা বাণও এগিয়ে গেলেন রথের দিকে। কাছে আসতেই দেখতে পেলেন রাজা নরকাসুরের বিবর্ণ মুখমণ্ডল যেন আরও বিবর্ণ হয়ে গেছে।

বাণ দ্রুত রাজা নরকাসুরের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিহে তোমাকে অমন বিষণ্ণ কেন দেখছি? কি হয়েছে তোমার?

রাজা নরকাসুর প্রথমে বাণ রাজার কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না। নীরব রইলেন।

তাঁকে নিরুত্তর থাকতে দেখে পুনরায় বললেন বাণ রাজা, ভাই নরক! তুমি কথা বলছো না কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

এবার রাজা নরকাসুর বললেন, আমি তোমার প্রতি রাগ করি নি ভাই। ববং তোমার আচরণে আমি দুঃখ পেয়েছি।

কেন ভাই, প্রশ্ন করলেন রাজা বাণ।

রাজা নরকাসুর বললেন, কেন আবার। তুমি আমার বাড়ী হতে চলে এসেছ। একটু অপেক্ষা করতে পারলে না। আমি সে সময় মা কামাখ্যার পূজো করছিলুম। সুতরাং পূজো শেষ না করে আমি কিভাবে আসতে পারি তোমার কাছে। তুমি যদি আমার অবস্থা অনুমান করে আমার জন্যে প্রাসাদে একটু অপেক্ষা করতে তাহলে আমি খুশীই হতাম।

ধীরভাবে নরকাসুরের কথাগুলি শুনলেন রাজা বাণ। তারপর বললেন, অপেক্ষা করার মত ধৈর্য আমার ছিল না। তাছাড়া তোমার একটা কাজের জন্যে আমি তোমার ওপর বিরূপ হয়েছি।

কি সেই কাজ? প্রশ্ন করলেন রাজা নরকাসুর। বাণ বললেন, ছাখো নরক, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে অনেকদিন আগে। তোমার আমার মধ্যে অনেকবিষয়ে মিল আছে আবার অনেক

বিষয়ে গরমিলও আছে। একটা গরমিলের কথা আমি এখন বলি। সেটা হচ্ছে এই যে তুমি দেবী কামাখ্যার পুজো করো। আমি কিন্তু তোমার এই পুজো আদৌ অনুমোদন করি না।

রাজা নরকাসুর বললেন, কেন ?

—কেন আবার কি! এর দ্বারা তোমার শক্তির অপচয় ঘটছে।

—না বাণ! এ তোমার ভুল ধারণা। দেবী কামাখ্যাব অর্চনা করি বলেই আমি সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটাতে পারছি। তা নাহলে কবে যে ধ্বংশ হতুম তা জানেন একমাত্র ঈশ্বরী—আমার ইষ্টদেবী মাতা কামাখ্যা।

রাজা নরক এভাবে রাজা বাণের কাছে দেবী কামাখ্যা প্রসঙ্গে এক বিরাট বক্তৃতা দিলেন।

রাজা বাণেব কিন্তু তা আদৌ পছন্দ হলো না। তিনি তাঁর কথা শুনেও শুনলেন না।

পরে রাজা বাণ দৃঢ়তাব সঙ্গে জানালেন, হে নবক! তুমি নিতান্ত ভাবে মোহগ্রস্থ হয়েছ। দেবী কামাখ্যার পূজো করলে তুমি আরও অধোগামী হবে। তামসিক বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হলে তোমার সর্বনাশ অবশ্যই ঘটবে। তুমি তাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা পাবে না। তাই বলছি, তুমি দেবীর পূজো ত্যাগ করো।

বাণের কথা শুনে উত্তেজিত হলেন রাজা নরক। তিনি বললেন, দরকার হলে তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ছেদ পড়তে পারে কিন্তু আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না মাতা কামাখ্যার পূজোয় বিরতি দেওয়া। এ জিনিষ আমার পক্ষে মৃত্যুর সামিল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে আমি যদি কামাখ্যার পূজো না করি তাহলে দেবতারা আমার প্রতি রুষ্ট হবেন। বিষ্ণুই আমার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হবেন। কারণ তিনি আমার পিতা আর তিনি আমাকে এই বলে নিষেধ করে দিয়েছেন যে দেবী কামাখ্যার

পূজো ছাড়া আর কারও পূজোতে মাথা ঘামিয়ো না।' আমি তাই বিষ্ণুর কথামত দেবী কামাখ্যার অর্চনায় ব্রতী আছি।

রাজা নরকের কথা শুনে রাজা বাণ আরও উত্তেজিত হয়ে মত প্রকাশ করলেন, তুমি বিষ্ণুর কথা শুনো না। ও হচ্ছে বড় কৌশলের কথা। দেবতারা আমাদের শক্তিকে এভাবে নষ্ট করতে চাইছে। আমাদের মনকে যদি এভাবে তারা মোহগ্রস্থ করতে পারে তাহলে তারা হবে লাভবান। কেন না আমরা হচ্ছি অসুর জাতি। আমরা মাঝে মাঝে দেবতাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করি এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভও করি। তাই দেবতারা নিজেদের একছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এইরকম কৌশল অবলম্বন করেছে। এতে করে আমাদের মন নিম্নগামী হলে আমরা আর বড় জিনিষের কথা চিন্তা করতে সমর্থ হবো না। ফলে আমরা চিরকাল পরাধীন থেকে দেবতাদের খেয়ালখুশী মত জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে অগ্রসর হবো। এ আমাদের পক্ষে কম বড় কথা নয়। এর সুদূরপ্রসারী গতি তুমি কি কখনো চিন্তা করেছ? তুমি কেন এরকম রাজনৈতিক চালে সাড়া দিলে নরক। এ হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে মস্তবড় এক রাজনৈতিক চাল; তুমি বুঝতে পারো না বলে তাই তোমার ওপর দিয়ে ওরা এই জিনিষটা পরীক্ষা করে দেখছে। আমি কিন্তু ধরে ফেলেছি। তাই তো তোমাকে ঠিক সময়ে সতর্ক করে দিতে এসেছি।

বাণের কূটবুদ্ধিযুক্ত কথা আদৌ পছন্দ হলো না রাজা নরকের। তিনি দু'কানে হাত চাপা দিয়ে উচ্চৈস্বরে বললেন, চুপ করো বাণ— চুপ করো। তোমার বক্তৃতা থামাও। আমার আর সহ্য হচ্ছে না তোমার ঐ দীর্ঘ বক্তৃতা। যদি আদেশ করো তো আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি।

এই বলে রাজা নরক মুখের ওপর দু'হাত চাপা দিয়ে হাঁটু গেড়ে এক জায়গায় উপবেশন করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

ওদিকে রাজা বাণের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি কিছুমাত্র নিষ্প্রভ হলো না। তাঁর অন্তরও দেবতাদের প্রতি রাগে ও অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তিনি পুনরায় গর্জে উঠলেন, আমার কথা শুনে তুমি যদি ব্যথিত হও তাহলে আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারো। আমি ঠিক কথাই বলেছি নরক। ভবিষ্যতে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।

রাজা নরক বললেন, জোড়হাত করে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বাণ। আমি আব কখনো তোমার সঙ্গে দেবতাদের বিষয় নিয়ে কথা বলবো না।

এইটু থেমে রাজা নরক পুনরায় বললেন, আচ্ছা আজকের মত বিদায় চেয়ে নিচ্ছি তোমার কাছে।

বাজা বাণ বললেন, তুমি নিজেব প্রাসাদে ফিরে গিয়ে আমার কথা চিন্তা কোরো নবক। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলেছি।

বাণেব কথা সম্পূর্ণভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করাব আগেই তাঁর প্রাসাদ ত্যাগ করলেন রাজা নরকাসুর।

নিজের প্রাসাদে ফিরে এসেছেন রাজা নরকাসুব। প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুত চলে গেলেন নিজের সাজ ঘরে। সেখানে সমস্ত সাজসজ্জা খুলে রেখে পরে প্রবেশ করলেন বিশ্রামাগারে। তাঁকে বড় চঞ্চল বোধ হতে লাগলো।

স্ত্রী মায়াব কানে গেল রাজা নরকের কথা। তিনি অন্তঃপুর থেকে দ্রুত চলে এলেন স্বামীর কাছে। স্বামীকে ওরকম উত্তেজিত হয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, নাথ! আজ আপনাকে এমনভাবে চিন্তান্বিত কেন দেখছি? কি হয়েছে আপনার?

স্ত্রীর কথা শুনেও শুনছেন না রাজা নরক এমনভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। মৌনী হয়ে কি যেন চিন্তা করে চলেছেন।

স্ত্রী মায়া পুনরায় বিনীত স্বরে অনুরোধ জানালেন স্বামীকে,

নাথ! কি আপনার দুঃখ দয়া করে আমাকে একবার জানান। আমি তার প্রতিকারের উপায় করবো।

এবারও নিরুত্তর রইলেন রাজা নরক। তিনি নীরব থেকে গভীরভাবে একমনে চিন্তা করে চলেছেন।

তাঁকে দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব থাকতে দেখে আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না মহারাণী মায়া। স্বামীর পদতলে পতিত হয়ে উচ্চৈস্বরে রোদন শুরু করে দিলেন। সেই সঙ্গে আকুতিভরা কণ্ঠে বিনীতভাবে নিজের প্রাণের কথা প্রকাশ করলেন, নাথ! আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি তো আমাকে ক্ষমা করুন। না জেনে হয়তো আমি আপনার অমঙ্গলের কথা চিন্তা করেছি -আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়েছি। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করে সুস্থির হোন—অন্নজল গ্রহণ করুন।

এইরূপ বলতে বলতে রাণী মায়া অজস্র ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর অন্তর হতে বিগলিত অশ্রুপ্রস্রবনে ভিজে যেতে লাগলো রাজা নরকের শ্রীচরণযুগল।

এবার তিনি যেন প্রকৃতিস্থ হলেন। দুঃখিনী ও সতীসাধ্বী স্ত্রী মায়ার মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাকিয়ে তিনি যেন মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দেখলেন সুন্দরী জনকদুহিতার মুখমণ্ডলের শোভা আর পূর্ণিমা চন্দ্রের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে না। তার জায়গায় শোভা পাচ্ছে প্রাবৃটকালের মসীবর্ণের জলদপুঞ্জ। তিনি তখন স্থির থাকতে পারলেন না। আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সুচারু ও সুউন্নত বলিষ্ঠ দু'বাহু সামনের দিকে প্রসারিত করে মায়াকে ভূমি হতে তুলে দাঁড় করালেন নিজের মুখোমুখি।

তারপর গভীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, দেবী! অশ্রু সংবরণ করো।

এরপর রাজা নরক স্ত্রীর কাছে নিজের অন্তর বেদনার কথা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, রাজা বাণ আমাকে

পরামর্শ দিয়েছেন আমি যদি দেবী কামাখ্যার পূজো নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি তাহলে অধোগামী হবে। সুতরাং অবিলম্বে আমার উচিত হবে দেবী কামাখ্যার অর্চনা নিষিদ্ধ করা।

স্বামীর মুখ থেকে এরকম কথা আশা করেন নি স্ত্রী মায়াদেবী। তিনি ভীত ও সচকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, নাথ! দেবীর কৃপায় আপনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছেন। এখন যদি আপনি দেবীকে অশ্রদ্ধা করেন তাহলে আপনাকে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

রাজা নরক বললেন, কিন্তু দেবী কামাখ্যাকে পূজো করলে আমি যে দিন দিন শক্তিহীন—ক্লীবে পরিণত হবো। তখন দেবতাদের কাছে আমি অস্ত্রবলে পরাজিত হবো। সুতরাং ভাবছি, বাণের কথাই হয়তো সত্য। আর আমি দেবীর আরাধনা করবো না।

—সেকি কথা মহারাজ। আপনার মুখে এরকম অদ্ভুত কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। দেবী কামাখ্যাকে অর্চনা করলে কারও দেহ-মনে শক্তি-ক্ষয় হয় না, বরং শক্তির সঞ্চয় হয়। সে হয় জগৎজয়ী। তাছাড়া অস্ত্রবলে বলীয়ান হওয়াকেই পুরুষের পরম পুরুষার্থ নয়। পুরুষের আসল পুরুষার্থ প্রকাশ পায় তার অসম্ভব চরিত্রগুণে, তার পরম ঔদার্য্যে এবং অন্তরের অকৃপণ মহানুভবতায়। দেবী কামাখ্যার আশীর্বাদে আপনার চিত্ত হয়েছে শান্ত—অন্তর হয়েছে অনন্ত আকাশের মত প্রসারিত। আপনি সেই দেবীকে একান্ত মনে আরাধনা করেন বলে আপনার মধ্যে থেকে অসুরদের সব ক'টি দোষ হয়েছে নির্বাসিত। দেবতাদের গুণাবলী আপনাতে আরোপিত হয়েছে। তাই আপনি ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের কাছে পরম শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছেন। আর আপনি যদি দেবীর পূজো না করে তাকে অবহেলা করেন তাহলে দেবী আপনার ওপর রুষ্টা হয়ে আপনার প্রতি ক্রুদ্ধা হবেন। ফল হবে মারাত্মক। আপনার মধ্যে যেটুকু দেব ভাব সঞ্চিত হয়েছে সেইটুকু নষ্ট হবে।

স্ত্রীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন নরকাসুর। তাঁর অন্তর তখনো পর্য্যন্ত অশান্ত ছিল। তাই স্ত্রীর কথায় ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, তোমার কথা আমি সত্য বলে মনে করতে পারছি না। আমার মন বলছে যেন রাজা বাণের কথাই ঠিক। আমি কাল থেকে দেবী কামাখ্যার পূজো বন্ধ করে দেবো।

রাণী মায়া পুনরায় বললেন, না দেব, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। দেবীর অর্চনায় কখনো বাধা আনবেন না। আজ রাত্তিরে আপনি নির্জনে চিন্তা করে দেখুন। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেন।

স্ত্রীর কথা শান্তচিত্তে মেনে নিলেন রাজা নরকাসুর।

দিন শেষ হয়ে রাত্রি এলো। চারদিকে আলো জ্বলে উঠলো। প্রাসাদের প্রধান দ্বারে বেজে উঠলো শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি। সেইসঙ্গে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে আরম্ভ হলো সগম্ভীর এবং পবিত্র পরিবেশের মধ্যে পূজার্চনা।

রাজা নরক প্রাসাদের মধ্যে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারলেন না। এক বিক্ষিপ্ত চিন্তায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত—দেহ অবসন্ন। তিনি অশান্ত মনে বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ হতে। একপ্রকার দৌড়ে চলে এলেন দেবী কামাখ্যার মন্দিরে। আছড়ে পড়লেন মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে।

তাঁর ঐ অবস্থা লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হলেন মায়ের পূজকরা। সসম্ভ্রমে স্থান ত্যাগ করে রাজার বসবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আসনে বসলেন না রাজা নরকাসুর। ঐ শোওয়া অবস্থায় তিনি বারংবার দেবী কামাখ্যার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, বলুন মা কামাখ্যা, রাজা বাণের কথা কি সত্যি? আমি আপনার পূজো করলে কি শক্তিহীন হয়ে যাবো?

এমনিভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। মায়ের কাছ থেকে কোনরকম উত্তর পেলেন না রাজা নরক ; ফলে তাঁর অন্তরবেদনা স্পর্শ করলো ধৈর্য্যস্তম্ভের শেষ প্রান্ত। পূর্বাপেক্ষা আরও অশান্ত হয়ে উঠলো তাঁর চিত্ত। তিনি ক্রোধে বলে উঠলেন, আজ তুই সাড়া দিলি না মা। আমার কথা তুই রাখলি না। আমাকে কেবল দুঃখ দিলি। মা হয়ে সন্তানকে তুই দেখলি না। বেশ, তুই যদি আমাকে না দেখিস তাহলে আমিও তোকে দেখবো না। তোর পুজোও আর করবো না।

এই বলে কণ্ঠভরা অভিমান নিযে ফিরে এলেন রাজা নরকাসুর দেবীর মন্দির হতে। রাজপ্রাসাদে আসার পর থেকে তাঁর মন-মেজাজ গেল বদলে। আসুরিকভাবে ভাবিত হয়ে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করে দিলেন। আগে তিনি সুস্থিব হয়ে সব কাজ করতেন। এখন তিনি হয়ে উঠলেন চঞ্চল। কোন কাজে আর বিনয়ীভাব রইলো না। জননী ও স্ত্রীব প্রতি দেখাতে লাগলেন রূঢ় ভাব। প্রজা সাধারণও তাঁর মধ্যে এরকম রূপান্তর দেখে বিস্মিত হলো। ব্রাহ্মণ ও মুণিগণের প্রতিও রাজা নরকাসুর মন্দভাব দেখাতে লাগলেন। এখন থেকে তাঁর প্রাসাদে চললো সুরা আর নারীর আগমন। আগে যেখানে চলতো নিত্য শাস্ত্রপাঠ, মুনিদের সাদর আপ্যায়ণ এখন সেখানে চলেছে বিলাসিনী নারীদের লাস্যময়ী নৃত্য আর সুরার স্রোতধারা। রাজা নরকাসুর তাঁর ইষ্টদেবী কামাখ্যাকে ভুলে নারী আর সুরার নেশায় মত্ত হয়ে উঠছেন।

সতীস্ত্রী মায়াদেবী স্বামীর মধ্যে এইপ্রকাব ভাব দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানালেন, নাথ! আপনি এখুনি এই সর্বনাশা কাণ্ড হতে বিরত হোন। তা নাহলে আপনার ভাগ্যে লেখা আছে সর্বাত্মক বিনাশ।

সুরার নেশায় বিগতবুদ্ধি নরক স্ত্রীর কথা শুনে তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে লাগলেন। কেবল তাই নয় সকলের সামনে স্ত্রীকে

করতে লাগলেন অপমান। এমনকি তাঁকে শাস্তি দেবার জন্যে প্রাসাদের একটি ঘরে বন্দী করে রাখলেন কয়েকদিন।

এভাবে রাজা নরকাসুর ভুলে গেলেন দেবভাব। অসুরভাবে ভাবিত হয়ে রাজ্যের মধ্যে চালাতে লাগলেন নানারকম অত্যাচার।

একদিন এক বিরাট জলসার আয়োজন করেছেন রাজা নরকাসুর। সেই জলসায় সমবেত হয়েছেন বহু মান্যগণ্য অতিথি। এসেছেন সপারিষদ রাজা বাণ। তাঁকে আজ বেশ হাসিখুসী দেখাচ্ছে। মনে যেন ষোলআনা তৃপ্তি রয়েছে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর অঙ্গের প্রতিটি রোমকূপে।

রাজা বাণ আসতেই রাজা নরকাসুর খুসীতে লাফিয়ে উঠলেন। দ্রুতপায়ে চলে এলেন রাজা বাণের কাছে। এসে তাঁকে দৃঢ় ভাবে আলিঙ্গন করে বললেন, হে বাণ! আজ আমি তোমাকে পেয়ে সত্যিই সুখী। আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হবে। তুমি যেমন ভাবে বলেছ ঠিক তেমন ভাবে আমি আজকের এই উৎসবের আয়োজন করেছি। আজ এই উৎসবে কাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছি জানোতো?

বাণ বললেন, কাকে?

নরকাসুর বললেন, আরে উর্বশীকে। উর্বশী এসে আমার সভাকে ধন্য করবে।

সে কি, উর্বশী এসে আপনার নৃত্যসভায় নৃত্য প্রদর্শন করবে? বললেন রাজা বাণ। তাঁর দু'নয়নে প্রকাশ পাচ্ছে বিস্ময়ের বিজলীচমক।

বাণের কথা শুনে রাজা নরকাসুর প্রশ্ন করলেন, তুমি অবাক হলে কেন বাণ? উর্বশীকে কি আমার মত রাজা আনতে পারে না?

রাজা বাণ বললেন, তা জানিনা তবে আমি অনেকবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। উর্বশী হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভা-নর্তকী।

সুতরাং তার চাহিদা অনেক। সে কি আমাদের মত গরীবের সভায় নৃত্যভঙ্গিমা দেখাতে আসবে!

বাণের কথা শুনছেন রাজা নরক। সেইসঙ্গে সুরাপান করে চলেছেন। সুরের নেশায় তাঁর দু'চোখ বুজে আসছে। তবু তিনি জোর করে আঁখিপত্র উন্মোচিত করে স্খলিত ভাষায় বলতে লাগলেন, কেন আসবে না উর্বশী, নিশ্চয়ই আসবে। একটা কথা জানো ভাই। টাকা সবসময় বড় জিনিষ নয়। টাকার চেয়ে বড় জিনিষ আছে। সেটা হচ্ছে প্রাণের চাহিদা আর মনের খোরাক। কেউ এক জায়গায় চিরকাল একভাবে থাকতে চায় না সে যদি প্রচুর সুখৈশ্বর্য্যের মাঝে থাকেও। তার মনে নেমে আসে একঘেঁয়েমীর জড়তা। তাই তার মনকে সুস্থ ও সবল করবার জন্যে অন্যত্র চলে আসতে হয়। তেমনি রাজা ইন্দ্রের নৃত্যসভায় সুন্দরী নর্তকী সুখে থাকলেও সে মাঝে মাঝে নেমে আসে মর্ত্যে মনের বীণায় নতুন সুর সংযোজন করবার জন্যে। আমিও তেমনি ভাবে নর্তকীকে কাছে পেয়েছি। দ্যাখো না বসে আজ সে কেমনধারা নৃত্য করবে আমার এই বিলাসবহুল এবং বহুনৃপতিবাঞ্ছিত মনোহর নৃত্যসভায়।

রাজা নরকাসুরের কথা শেষ হতে না হতেই হাতে মদ্যপাত্র নিয়ে প্রবেশ করলে উর্বশী। তার হাতে যে সুরাপাত্র ছিল তা পূর্ণ। নৃত্যের ভঙ্গিমায় সে রাজা নরকাসুরের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর তাঁকে একটা প্রণাম জানিয়ে সুরাপাত্র হাতে নিয়ে নৃত্য শুরু করে দিলো। মোহিনী নৃত্য আরম্ভ করলো। সাগর মন্থন করে বিষ্ণু মোহিনীর রূপ ধারণ করে হাতে অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে দেবতাদের অমৃত পরিবেশন করেছিলেন। দেবতারা বিষ্ণুর ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। মোহিনীর চোখে ছিল মায়ার সুতীব্র আকর্ষণ। তারই জন্যে সে দেবতার চোখে বিভ্রম দৃষ্টি করেছিল। এবার উর্বশী রাজা নরক ও রাজা বাণের চোখে লেপন করলে মায়ার কাজল। তাঁরা উর্বশীর অপরূপ নৃত্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। রাজা বাণ তো

তাঁর চরণের দিকে একজোড়া মূল্যবান অলঙ্কার নিক্ষেপ করলেন। তাই উর্বশী রাজা বাণকে নমস্কার জানালে।

এমনিভাবে বেশ জমে উঠেছে নাচের আসর। এই সময় হঠাৎ এক অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল। নৃত্যসভার এক স্থান হতে উপস্থিত হলেন এক সুন্দরী যুবতী। তার যেমন রঙ তেমনি দেহশ্রীও অতি অপরূপ। মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, এ মেয়ে স্বর্গেও দুর্লভ। এই দুর্লভদর্শন মেয়েটির চোখমুখেব লাস্যভাব দেখলে কার না চিত্ত প্রেমরসে দ্রবীভূত হয়।

নৃত্যপরা দুর্লভদর্শন সুন্দরী নর্তকীকে দেখে নরকাসুবের চিত্ত আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো। তিনি সুরাপাত্র হাতে নিয়ে টলতে টলতে চলে গেলেন যুবতীর দিকে।

যুবতীও তাঁকে নানারকম ছলাকলায় মুগ্ধ করতে লাগলো। যুবতীর আকর্ষণে নরকাসুর এমনি মোহিত হয়ে গেলেন যে তাঁর স্থান কাল পাত্র ভেদাভেদ জ্ঞান আর রইলো না।

একসময় নৃত্য করতে করতে যুবতী চলে এলো নৃত্যসভার বাইরে। প্রাসাদের ফুলবাগানে প্রবেশ করে সেখানেও নৃত্য সুরু করে দিল।

রাজা নরকাসুরও চলে এলেন তার সঙ্গে। আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন যুবতীর হাত ধরে। যুবতী তাঁর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল অন্যত্র। আবার সুরু করে দিলে নৃত্য।

এবার রাজা নরকাসুর আরও উত্তেজিত হয়ে কামনাভরা মদির দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে গেল যুবতীর দিকে।

যুবতী হঠাৎ নৃত্য বন্ধ করে বললে, স্তব্ধ হও নরক। অতি বাড় বেড়ো না।

রাজা নরকাসুর বললে, তুমি কে সুন্দরী? তুমি আমার প্রাসাদে চলো।

যুবতী বললে, আমি স্বর্গের রমণী। তোমার কাছে এসেছি তোমার মন পরীক্ষা করতে। আমি তোমার ঐ পুরানো প্রাসাদে

আসতে রাজী নই। আমাকে যদি তোমার রাখতেই ইচ্ছা জাগে তাহলে আমার জন্যে তৈরী করো এক সুন্দর প্রাসাদ।

একটু থেমে যুবতী নর্তকী পুনরায় বললে, তবে হ্যাঁ একটা সর্ত আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, এক রাতের মধ্যে প্রাসাদটি নির্মাণ করে দিতে হবে। তা যদি না পারো তাহলে আমি কিন্তু তোমার কাছে থাকবো না।

যুবতী নর্তকীর কথা শুনে খুসী হলেন নরক। তাঁর মন অভাবিত আনন্দে নৃত্য সুরু করে দিলে। গুণগুনিয়ে গান গাইতে লাগলেন। ভাবলেন, যুবতী নর্তকীর মন তাহলে বশে এসেছে। ও আমার ভোগ্যা হয়ে আমার কাছেই থাকবে। স্বর্গে আর চলে যাবে না। ওর জন্যে যেমন করে হোক একটা প্রাসাদ গড়ে তোলা চাই। এর জন্যে যত পরিশ্রম করতে হয় করবো।

পরদিন রাজা নরকাসুর প্রাসাদ তৈরীর জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। এক রাত্রির ভেতবে প্রাসাদ তৈরী করা চাই। এর জন্যে যথেষ্ট লোকবল এবং অর্থবল প্রয়োজন। রাজভাণ্ডার বোধহয় শূন্য হয়ে যাবে। তা হোক। তবু সুন্দরী এবং দুর্লভদর্শনা যুবতীর জন্যে প্রাসাদ গড়ে তুলতেই হবে। ঐ দেববাঞ্ছিতাকে তাঁর চাই একান্তভাবে। তার বিনিময়ে যত মূল্য লাগুক না কেন।

ইতিমধ্যে রাজা নরকাসুর ঐ সুন্দরী নর্তকীকে তাঁর প্রাসাদের একটি কক্ষে আটক করে রাখলেন। তাঁব ধারণা এভাবে যুবতীকে নজরবন্দী করে রাখলে সে আর স্বর্গে পালাতে পারবে না। তারপর তার জন্যে নতুন প্রাসাদ গড়ে তোলা হলে সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে।

মহা ধুমধাম করে প্রাসাদ গড়ে তোলবার আয়োজন করা হলো। এক লক্ষ শ্রমিক ও রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত হলো। রাজা নরকাসুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্মাণকার্য তদারক করতে লাগলেন।

মধ্যরাতে রাজার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, এক রাতের মধ্যে হয়তো প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভব হবে না।

তথাপি তিনি শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়ে বললেন, যেমন করে হোক দ্বিগুণ পরিশ্রম করে তোমাদের কর্তব্য হবে এক রাতের মধ্যে নতুন প্রাসাদের নির্মাণ কার্য শেষ করা। তার জন্যে আমি তোমাদের দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে কুণ্ঠিত হবো না।

রাজা নরকাসুরের কথামত শ্রমিকগণ দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়ে কাজ করতে লেগে গেল। রাজাও সারারাত্রি জেগে থেকে অতন্দ্র প্রহরীর মত শ্রমিকদেব কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। আবার পুনঃপুনঃ আকাশের পূর্বদিগন্তের দিকে তাকাতে লাগলেন সূর্য উঠছে কিনা প্রত্যক্ষ কবাব জন্যে। তাঁর মানসিক অবস্থা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলো। প্রাসাদের ছাদের ওপর চঞ্চলভাবে পায়চারি করতে করতে একবার তাকালেন নির্মীয়মান নতুন প্রাসাদের দিকে আর একবার তাকালেন পূর্বদিগন্তে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো রক্তাভ উজ্জলরেখা পূব দিগন্তের অন্ধকার ধীবে ধীবে নাশ করতে লেগেছে। তাই দেখে ভাবলেন, এবার তো তাহলে রবির উদয় হচ্ছে। সুতরাং আর অপেক্ষা কবা যায় না।

এই প্রকার চিন্তা করে তিনি মূল প্রাসাদের ছাদ থেকে নেমে দ্রুতগতিতে চলে এলেন নবনির্মিত প্রাসাদের সামনে। কর্মরত শ্রমিকদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেল। সূর্য উঠছে। আর দেরী নেই। ঐ ত্যাখো পূব-দিগন্তে আলোক রেখা প্রকাশ পেয়েছে।

এই বলে রাজা নরক কর্মরত শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে হাত উঁচিয়ে পূব দিগন্তের রবিরশ্মির ক্ষীণরেখা প্রত্যক্ষ করালেন।

পরে রাজা নরক চলে এলেন নিজের প্রাসাদে।

শ্রমিকরা ঐ রেখা দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হলো। পরস্পর হল্লা শুরু করে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে লেগে গেল।

কিন্তু উৎসাহ দেখালে কি হবে। কাজ শেষ হবার আগেই সূর্য্যোদয় ঘটলো। নাশ হলো চতুর্দিকের অন্ধকার। দিনের আলোর মধ্যে দেখা গেল অর্দ্ধ নির্মীয়মান রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের চতুর্দিকে চারটি সিঁড়ির সারি, চার দেওয়াল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়েছে। বাকি আছে ছাদ গাঁথতে। তা আর গাঁথা হলো না। তার আগে ভোর হয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেন, রাজা নরকাসুরের মনটা দুর্বল করে দেবার জন্যে দেবী কামাখ্যা ছলনা করে মোরগের ডাক ডাকলেন। মোরগের ডাক শুনতে পেয়ে রাজা ভাবলেন বুঝি ভোর হয়েছে। কিন্তু প্রাসাদ তখন তৈরী হতে দেরী রয়েছে। রাজা তখন মোরগকে মারতে উদ্যত হলেন। মোরগও দৌড়লো। রাজা তাকে অনুসরণ করতে করতে চলে এলেন ব্রহ্মপুত্র নদের অন্যপারে। সেখানে বধ করেন মোরগটিকে। রাজা নরকাসুর যেখানে মোরগটিকে বধ করেন তার নাম এখন 'কুকুরা বাটাচকী'।

মোরগটিকে বধ করে ফিরে আসতে আসতে রাজা দেখলেন পূর্ব দিগন্তে শোভা পাছে সূর্যের উজ্জ্বলছটা। তখন তাঁর আশা ভঙ্গ হয়েছে দেখে রাগে ও দুঃখে মরমে মরে গেলেন।

যাক শ্রমিকরা দুঃখিত মনে রাজার কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। তাদের মনে এক প্রকার শঙ্কা দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। ভাবলে, প্রাসাদ তৈরী সমাপ্ত হলো না। একথা রাজা শুনলে তিনি উত্তেজিত হবেন। রাগের বশে আদেশ দেবেন আমাদের মাথা নেবার। সুতরাং আর আমাদের জীবনের আশা নেই।

তারা ভয়ে ভয়ে এগুতে লাগলো রাজা নরকাসুরের প্রাসাদ-অভিমুখে। রাজা তখন তন্দ্রাতুর। প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিজকক্ষের মধ্যে একটি সোফার ওপর বসে আছেন। সারারাত জেগে কাটিয়েছেন। শেষ রাতে সামান্য তন্দ্রা এসেছে।

শ্রমিকদের কোলাহল শুনে চমকে উঠলেন রাজা নরকাসুর। জিজ্ঞেস করলেন, এত কোলাহল কেন? কি হয়েছে তোমাদের?

রাজার কথা শুনে শ্রমিকরা ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো, রক্ষা করুন মহারাজ। আমাদের বাঁচান। প্রাসাদ শেষ হবার আগেই সূর্য্যোদয় হয়ে গেছে। তাই আমরা কাজে বিরতি দিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

ক্রোধে আরক্ত বদনে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রাজা নরকাসুর শঙ্কিত এবং কোলাহলমুখর শ্রমিকদের মুখপানে। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বেরুল না তাঁর মুখ হতে। পরে ধীরে ধীরে বললেন, আমার যা আদেশ ছিল তাই আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। তার একচুলও এদিক ওদিক হবে না।

রাজার আদেশ যেন কামানের মত গর্জন করে উঠলো। সেই গর্জনে শ্রমিকচিত্ত আহত চিতার মত ক্ষোভে ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে বিরাট আকাশতলে কান্নার রোলে ফেটে পড়লো। তারা মিনতির সুরে রাজার কাছে পুনরায় প্রার্থনা জানাতে যাবে এমন সময় রাজা নরকাসুর দ্রুতপদে চলে এলেন অন্তঃপুরে। আসার আগে একবার ভাল করে দেখে নিলেন নবনির্মিয়মান প্রাসাদটির দিকে। দেখলেন প্রাসাদের সবকিছু তৈরী করা শেষ হয়েছে। বাকি আছে তার ছাদ তৈরী করতে।

অন্তঃপুরে এসে রাজা চলে গেলেন সেই কক্ষের সামনে যে কক্ষে বন্দী করে রেখেছিলেন সেই তন্বী নর্তকীকে।

কক্ষের দরজায় হাত স্পর্শ করতেই তা উন্মুক্ত হয়ে গেল তাঁর সামনে। কৌতূহল ও বিস্ময় ভরা নয়নে তাকাতে লাগলেন কক্ষের অভ্যন্তরে। দেখলেন, কক্ষের মধ্যে নেই সেই সুন্দরী তিলোত্তমাসাদৃশী দুলর্ভা নর্তকী। কক্ষ শূন্য।

ঐ দৃশ্য প্রথম দেখা মাত্র রাজা নরকাসুরের মনে সন্দেহের উদয় হলো। ভাবলেন, তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখছেন।

পরে তিনি দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে ভাল করে চোখ মুছলেন। দ্বিতীয়বার ভাল করে তাকালেন। এবার দেখলেন, হ্যাঁ, ঠিক কথা। কক্ষ শূন্যই বটে। তার মধ্যে লোক নেই।

ঐ দৃশ্য দেখার পর রাজা উত্তেজিত হয়ে চারদিক ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিলেন। অনুসন্ধান করতে লাগলেন সেই সুন্দরী নর্তকীর প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে। তাকে অনুসন্ধানের জন্যে লোকজন নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তা সবই হলো বিফল। সুন্দরী নর্তকীকে আর পাওয়া গেল না প্রাসাদের মধ্যে।

এমনিভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। রাজা নরকাসুর শত চেষ্টা করেও খুঁজে পেলেন না সেই নর্তকীকে। এর ফলে তাঁর মন মেজাজ আরও ভিন্নরূপ হয়ে গেল। ভাবলেন এ বোধ হয় নিশ্চয়ই কামাখ্যার মায়ালীলা হবে। ঐ দেবীই হচ্ছেন যত নষ্টের মূল। সুতরাং ওঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা আর উচিত নয়।

এইরূপ চিন্তা করে রাজা নরকাসুর দেব-দ্বিজের প্রতি ভক্তির পরিবর্তে অশ্রদ্ধা দেখাতে লাগলেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতিও আর সদ্‌ব্যবহার দেখালেন না। উত্তেজিত হয়ে একদিন ঋষি বশিষ্টদেবকে অপমান করলেন। সেদিন বশিষ্টদেব নীলকূট পর্বতের গুহার মধ্যে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় রাজা নরকাসুরের প্রহরীরা বাধা দিলে। বললে, মন্দিরের দরজা বন্ধ। বিশেষ করে আপনাদের মত সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্যে।

প্রহরীর কথা শুনে বিস্মিত হলেন ঋষি বশিষ্ট। তবু তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, দরজা খোলো, আমি মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করবো।

এবারও প্রহরী উত্তর দিলে, দরজা খোলা হবে না। এ হচ্ছে রাজাজ্ঞা। আমি কি করে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারি?

বেশ আমি তাহলে তোমাদের রাজার কাছে যাচ্ছি, রাগতস্বরে

এই কথা বলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললেন ঋষি বশিষ্ঠ রাজা নরকাসুরের রাজপ্রাসাদ অভিমুখে।

পথে যেতে যেতে অনেক কথা মনে পড়ে গেল ঋষি বশিষ্টের রাজা নরকাসুর প্রসঙ্গে। একসময় রাজা কত ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি যে অসুর তখন তাঁকে দেখে বা কথাবার্তা শুনে মনে হতো না। তিনি দিনের পর দিন বশিষ্টের উপদেশ শুনেছেন। ঋষি বশিষ্টও তাঁর মনের কথা জানতে পেরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলি এখন একে একে মনে পড়লো মহর্ষির।

একবার ঋষি বলেছিলেন, প্রাক্তন পুরুষকার বা কর্ম ভিন্ন দৈব বলে স্বতন্ত্র আর কিছু নেই। সুতরাং দৈবকে দূরে পরিহার করে সাধুগণের সঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা কর্তব্য। বলশালী ব্যক্তি যেমন বালককে সহজেই পরাভূত করতে সক্ষম হয় সেইরূপ প্রবল ঐহিক কর্মদ্বারা অতি সহজেই পূর্বতন কর্ম নামীয় দৈবকে জয় করা সম্ভবপর। মোহবশে যারা তা না করে সেই দৈবপরায়ণ মানুষদের মূর্খ ছাড়া আর কি বলা যায়? দাঁত দিয়ে যে অন্নসকল চূর্ণ করা যায় সে তো পুরুষকার প্রয়োগ করেই করা হয়ে থাকে। বলবান লোক তেমনি অন্য মানুষকেও পরাভূত করে। সুতরাং ঐহিক প্রবল পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন পুরুষকারকে বিপর্য্যস্ত করা যাবে না কেন? জাগতিক পদার্থসকল দেশ, কাল ও তাদের নিজের নিজের শক্তি সহায়ে প্রকাশাবস্থা লাভ করে। দেশ ও কালও শক্তি বিশেষ। সুতরাং সমধিক যত্নশীল পুরুষ মাত্রেই তাদেরকে জয় করতে পারে। অতএব পুরুষকার অবলম্বন করে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সহায়ে বুদ্ধির মালিন্য বিদূরিত করে সংসার সমুদ্রের পারে যাওয়া কর্তব্য। যে লোক সদাচারী ও প্রযত্নরূপ কৌশলসম্পন্ন, সে সিংহের মত এই জগৎরূপ মোহপিঞ্জর হতে বেরিয়ে থাকে। যে ব্যক্তির যেমন অধিকার, আলস্য ত্যাগ করে তেমনি কর্ম করেই সে ক্রমে শক্তি লাভ করতে পারে। হাজার

হাজার কর্মরূপ ব্যবহার দিবারাত্র আমাদের কাছে আসছে এবং যাচ্ছে। রাগ ও দ্বেষ পরিহার করে শাস্ত্রের অনুসরণেই সেই সবেতে ব্যবহারবান হওয়া উচিত। অজ্ঞানতার কারণে যারা দৈবকে নিন্দা করে আমি তাদের নিন্দা করি না। তবে পুরুষকার ত্যাগ করে যারা দৈবে আস্থাশীল তাদের আমি নিন্দা করি।

আর একবার বলেছিলেন, পরিদৃশ্যমান এই যে জগৎরূপ মহান্ আড়ম্বর পরমপদে দৃষ্টি স্থাপিত হলে এসবই বিলীন হয়ে যায়। প্রলয়কালীন সূর্য্যের উদয়ে যেমন কুলাচল সকল বিশীর্ণ হয়, সেইরূপ পরমপদ লাভ হওয়া মাত্র যাবতীয় মনোব্যথার বিলীন হয়ে থাকে। সাংসাররূপ বিষের আবেশে যে বিসূচিকা রোগের উৎপত্তি হয়েছে এই পরম যোগরূপ গারুড় মন্ত্রে তার উপশম ঘটে। আবার এই গারুড় মন্ত্রও সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশে শাস্ত্রার্থ নির্ণয়দ্বারা লাভ করা যায়। বিচার দ্বারাই দুঃখের অবসান ঘটে। সুতরাং বিচারদৃষ্টিকে অবজ্ঞা করা অনুচিত। সাপের খোলস ত্যাগের মত বিচার ও বিবেকবান লোক প্রথমেই আধিস্বরূপ এই জগৎপঞ্জর ত্যাগ করবে। তারপর সম্যকদর্শন লাভ কবে আসল জগৎকে ইন্দ্রজালের মত দেখবে। যে এ পারে না অর্থাৎ সম্যকদর্শন যে ব্যক্তি লাভ করে নি এই জগতে তার দুঃখভোগই ঘটে থাকে। কেন না, সংসারে আসক্তি বড়ই বিষম। এ মোহগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাপের মত দংশন করে, খড়গের মত ছিন্ন ভিন্ন করে, আগুনের মত দগ্ধ করে আর রজ্জুর মত বন্ধন করে বুদ্ধিবৃত্তির ধ্বংস সাধন করে পাষাণের মত একেবারে অবশ করে ফেলে। জগতে এমন কোনও দুঃখ নেই, সংসারাসক্ত ব্যক্তি যা ভোগ করে না। হে রাজন। অতএব যেসব শাস্ত্রের বিচার করলে শ্রেয়োলাভ হয় সেইসব শাস্ত্রবিচারে অবহেলা কখনই কর্তব্য নয়। বিশুদ্ধচিত্ত উত্তম মানুষেরা বিচারের সাহায্যেই আত্মবোধরূপ প্রদীপ লাভ করে এই জগতে ভ্রমণ করেন। হে রাজন! চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা প্রসন্নতা লাভ করলে অন্তঃকরণে ব্রহ্মরসের উদয় হয়ে

শান্তি ও সর্বত্র সমরসের আস্বাদ ঘটে থাকে। অবচেতন এই দেহ হলো রথস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণ সেই রথের গতিস্বরূপ। প্রাণ পবনের বেগে সেই রথ চলছে। মন তার রশ্মি এবং গন্তব্যস্থল হলো আনন্দ। রথারোহী জীব অত্যন্ত ছোট হলেও সমাধিযোগে সে মহান হতে পারে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ঋষি বশিষ্ঠ চলেছেন রাজা নরকের প্রাসাদ অভিমুখে।

প্রাসাদের কাছে আসতেই তিনি প্রথম বাধা পেলেন রাজা নরকাসুরের জনৈক বয়স্যের কাছ থেকে। সে ঠাট্টা করে ঋষিকে বলতে লাগলো, খুব হয়েছে আর দরকার নেই সাধুগিরির। যত সব ভণ্ড জুটেছে। তোমাদের মত লোকেরাই দেশের ক্ষতি করছে। টিকি, দাড়ি বা জটা রেখে লোক ঠকাচ্ছ নিছক ধর্মের নামে। লোককে ভয়ও দেখাচ্ছ। এ তোমাদের পক্ষে একান্তভাবে অন্যায়। তোমরা যদি দেশের ভাল করতে চাও তাহলে ওসব বহ্বারম্ভ ত্যাগ করে আমাদের মত সহজ-সরল মানুষ হও।

এমনি সব অনেক কথা শুনিয়ে দিলে রাজা নরকাসুরের বয়স্য ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে।

ঋষি তার কথায় উত্তর না দিয়ে বললেন, আমি রাজা নরকাসুরের প্রাসাদে যেতে চাই। আমার যাত্রাপথ বিপদমুক্ত করুন।

বয়স্য বাধা দিলে। ইতিমধ্যে রাজা নরকাসুর এসে হাজির। ঋষিকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নরকাসুর। অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করতে লাগলেন। বললেন, আপনি কেন এখানে এসেছেন ?

ঋষি বশিষ্ঠ রাজার অমানুষিক ব্যবহার পেয়ে খুশী হলেন না। তিনি ক্ষণমাত্র নীরব থেকে উত্তেজিত ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন, তুমি মহাতেজস্বী বরাহের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে দেবতাদর্শন করতে দিচ্ছ না। হে বরাত্মজ! এ কি

তোমার কুল-প্রথামত কাজ করছো? মন্দিরের দরজা খোলবার আদেশ দাও। আমি দেবী কামাখ্যাকে দর্শন করি।

পৃথিবীপতি রাজা নরকাসুর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, না, কখনই তা সম্ভব নয়। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আপনি কামাখ্যার মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এবার ঋষি বশিষ্ঠ রাজা নরকাসুরকে শাপ দিলেন, পাপিষ্ঠ বরাহপুত্র! তুই যাঁর ঔরসে জন্মেছিস, মানুষরূপ ধারণ করে সেই মহাত্মা অচিরাৎ তোকে বিনাশ কববেন। পাপাত্মা! তোর মৃত্যু হলে তারপর জগৎমাতা কামাখ্যা দেবীকে পূজো করবো। তারপর ফিরে যাবো নিজের মন্দিরে। পাপিষ্ঠ! তুই যতদিন বেঁচে থাকবি ততদিন জগৎজননী কামাখ্যা সমস্ত পরিবারের সঙ্গে অন্তর্দ্ধান করবেন। তার আভাস তো পেয়েছিস যুবতী নর্তকীর অন্তর্ধানে।

এই বলে ঋষি বশিষ্ঠ চলে গেলেন নিজের জায়গায়। ঋষি চলে গেলে রাজা নরকাসুর এলেন কামাখ্যাদেবীব মন্দিরে। এসে দেখলেন, দেবী সেখানে নেই। দেবীর যোনিমণ্ডপ অদৃশ্য হয়েছে মন্দিরতল হতে।

তখন নরক বিমর্ষ হয়ে মাতা বসুন্ধরাকে এবং পিতা জগৎকর্তা নারায়ণকে স্মরণ করলেন। কিন্তু নীতিজ্ঞানশূন্য পুত্রের ব্যবহারে ধরিত্রী বা নারায়ণ কেউই সাড়া দিলেন না। রাজা নরক তখন ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে। এসে দেখলেন, প্রাসাদের চতুর্দিকের অবস্থা বড় বিবর্ণ। সকলের চোখে-মুখে কেমন যেন বিষাদের ছায়া। দেবী চলে গেছেন বলে বোধহয় এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে। পুরীর মানুষদের মনে আগেকার মত ধর্মে কোন আগ্রহ নেই। সকলের মনে দেখা দিয়েছে অন্যায় ও অত্যাচারের ভাব। কারও মনে নেই শান্তি। একটা বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল। বহু লোক হতাহত হলো। রাজার পাপের ফলে রাজ্যে দেখা দিল অরাজকতা। এমন কি ব্রহ্মপুত্র নদীর জল শুকিয়ে গেল।

রাজ্যমধ্যে এমন অনাচার ভাব প্রত্যক্ষ করে রাজা নরক ভাবলেন, তাঁর জীবনের শেষদিন ঘনিয়ে আসছে হয়তো। কেননা ঋষির দেওয়া ব্রহ্মশাপ না ফলে যে যায় না। এ শাপ ফলতে বাধ্য।

এবার তিনি কি করবেন তাই চিন্তা করতে লাগলেন, এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য তিনি যাবেন রাজা বাণের কাছে। বাণের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা বেশী। তাছাড়া বলিপুত্র বাণ হচ্ছেন শিবের বন্ধু। তাঁর মন্ত্রণার মূল্য আছে বৈকি।

রাজা বাণের কাছে যাবার আগে রাজা নরক প্রথমে দূত মারফৎ সংবাদ নিতে লাগলেন।

দূত এসে রাজা বাণের কাছে রাজা নরকাসুরের রাজ্যে যা কিছু ঘটছে তা সবই বললে।

শোণিতপুরের অধিপতি বাণ মিত্রের এমন দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। তিনি তক্ষুনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আসবার জন্যে তৈরী হলেন। দূতকে বললেন, তুমি রাজা নরকাসুরের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাও, আমি এখুনি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

দূত রাজা বাণের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। পরে রাজা নরকাসুরকে জানালে, হে রাজন! মহারাজ বাণ সত্বর আপনার রাজধানীতে আসছেন। আপনি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত হন।

রাজা নরকাসুর অন্তরে অন্তরে আনন্দ বোধ করলেন।

মহারাজ বাণের আগমন প্রতিক্ষায় কাল যাপন করতে লাগলেন।

নরকাসুরের রাজপ্রসাদে দলবলসহ এসেছেন রাজা বাণ। এসে যে সমস্ত অশোভনীয় দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর মন গেল খারাপ হয়ে। দেখলেন, রাজ্যের প্রজাদের মন ও স্বাস্থ্য উভয়ই ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের সর্বত্রই শ্রীহীন অবস্থা। এমনকি রাজ্যেশ্বর নরকাসুরের মন মেজাজ আগের মত আর সুন্দর ও

শ্রীমণ্ডিত নেই। শ্রীহীন হয়ে উঠেছে। রাজা বাণকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে রাজা নরকাসুর তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বাণ বললেন, আমি তো ভাল আছি কিন্তু অপনি ভাল নেই কেন? আপনার স্বাস্থ্য আগের তুলনায় খারাপ হয়ে গেছে। আপনার পুরী শোভাহীন হয়ে পড়েছে কেন? এসবের কারণ কি আমাকে দয়া করে বলুন।

রাজা বাণের কথামত রাজা নরকাসুর সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। পূর্ব প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে ঋষি বশিষ্ঠের শাপপ্রদান পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু জানালেন। এগুলি রাজা বাণ আগেই শুনেছিলেন তাঁর দূত মুখে।

বাণ সমস্ত শুনে নিয়ে বজ্রধ্বজ নরককে বললেন, এবিষয়ে শোক করা আপনার উচিত নয়। শরীরী মাত্রের সুখদুঃখ চক্রের মত পরিবর্তিত হয় কিন্তু কাকেও পরিত্যাগ করে না। দুঃখ উপস্থিত হলে ধীর ব্যক্তিদেব প্রতিকার করাই কর্তব্য। সেই প্রতিকারই মঙ্গলজনক হয়। আপনিও আশাকরি সম্প্রতি প্রতিকাব বিষয়ে যত্নবান হবেন। এই পৃথিবীতে মানুষ, দানব, অসুর বা কিন্নর যারাই বড় হতে চায় দেবরাজ ইন্দ্র তাকে বাধা দেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে কুটিলতা করে যেপ্রকাবে হোক বাধা দিয়ে থাকেন। ইন্দ্রের মনোমত দেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু। তিনি ইন্দ্রের সামান্য অনিষ্টও সহ্য করতে পারেন না। যে ইন্দ্রের অনিষ্ট করবো বলে বদ্ধপরিকর হয় বিষ্ণু তাকে আগে বাধা দেন। বিষ্ণুকে সুখী করতে হলে অনেক সাধ্যিসাধনার প্রয়োজন হয়। বহুকাল সাধনা করলে তবে তিনি সুখী হন। অত্যন্ত কায়ক্লেশে অর্চনা করলে তবে তিনি প্রসন্নভাব অবলম্বন করেন। ইষ্টদেবের আরাধনা ছাড়া কোন্ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হতে পেরেছে? আপনি আগে ব্রহ্মা ও শিবের আরাধনা করতেন না এইজন্যে আপনার রাজ্যে নানারকম অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যে বিষ্ণু আপনার পালক

তিনি সাধারণত কারও প্রতি প্রসন্ন হন না। কিন্তু আপনি ধরিত্রীর কথামত বিষ্ণুর আরাধনা করেছেন বলে তিনি আপনাকে বর দিয়েছেন। ঋষি বশিষ্ঠের কোন অপরাধ আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি এর অন্যথা আচরণ করলে হতশ্রী হবেন আর বশিষ্ঠের প্রতি অপরাধ আরোপ করবেন না। আপনি স্মরণ করলেও ধরিত্রী ও মাধব এলেন না। অতএব বন্ধু! এটা হরির বুদ্ধির কুটিলতাই মনে করবেন। এই সময়ে আপনার পক্ষে উদাসীন থাকা উচিত নয়। আপনি মনে করেন বিষ্ণুই আপনার পিতা। এইটিই আপনার ধ্রুব বিশ্বাস। কিন্তু বরাহই আপনার পিতা। তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েছেন। বরাহ হরির অংশ এরূপ যা আপনি শুনেছেন সেকথা ঠিক নয়। বরাহ হরির অংশ একথা কে বলে থাকে? অতএব আপনি এখন ব্রহ্মা ও শিবের অর্চনা করুন। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে আপনার কল্যাণ হবে। যত প্রকার বিঘ্ন হোক বা মুনিশাপ হোক না কেন ব্রহ্মা ও শিবকে তুষ্ট রাখতে পারলে আপনার মঙ্গল হবে। আপনাব সমস্ত বিপদ হবে বিনাশিত।

ভূমিপুত্র নরক রাজা বাণের কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, হে মিত্রবৎসল বাণ! আপনি যা বললেন আমি সেইমত আচরণ করবো। বিষ্ণু আমার আরাধনীয় নন। তার কারণ আপনি আগেই বলেছেন। শম্ভুও আমার আরাধনীয় নন। কারণ তিনি আমারই কাছে গুপ্তভাবে অবস্থান করছেন। অতএব আমার পক্ষে এখন অর্চনা করা প্রয়োজন ব্রহ্মাকে। সুতরাং হে মিত্র! আমি সেই ব্রহ্মার পুত্র লোহিত্যনদের তীরে তাঁর উপাসনা করবো। হে মিত্র, গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন তেমনি আপনার কথায় আমি উত্তম ভাবে উপদিষ্ট হয়েছি। এখন আমি তপস্যার জন্যে নদরাজ লোহিত্যের (ব্রহ্মপুত্র) তীরে গমন করি।

রাজা নরকাসুরের কথায় তৃপ্ত হলেন রাজা বাণ। তিনি নরককে

জানালেন, এবার তাহলে আমাকে প্রস্থান করার অনুমতি দিন রাজা নরকাসুর।

রাজা নরকাসুর বললেন, তথাস্তু। আপনার অশেষ দয়া। আজ আমার রাজপ্রাসাদ ধন্য হলো আপনার মত গুণী সুহৃদকে কাছে পেয়ে।

এই কথা বলে রাজা নরকাসুর রাজা বাণকে বিদায় দিলেন। তার আগে রাজার সম্মানের জন্যে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করলেন।

বাজা নবকাসুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাজা বাণ ফিরে গেলেন শোণিতপুরে।

ওদিকে রাজা নরকাসুর রাজবেশ পরিত্যাগ করলেন। ধারণ করলেন ত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ।

রাজা নরকাসুরের ঐ প্রকার কাণ্ড দেখে বিস্মিত হলো প্রজাগণ। ভাবলে, রাজার কি মাথা খারাপ হয়েছে? উনি এরকম আচরণ করছেন কেন?

ওরা কিন্তু রাজা নরকাসুরকে একথা বলতে সমর্থ হলো না। তাদের মনে ভরসা এলো না রাজাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে। তাই তারা একসঙ্গে চলে এলো রাণী মায়ার কাছে।

অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বললে, রাণী মা, আমরা বড় উদ্বেগ বোধ করছি।

কেন বৎস? কি হয়েছে তোমাদের? ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রাণী মায়া।

প্রজাবর্গ বললে, আমাদের রাজামশাই রাজবেশ ত্যাগ করেছেন। ধারণ করেছেন সন্ন্যাসীর বেশ।

—সেকি রে!

—হ্যাঁ রাণীমা।

—তোরা কিছু বলতে পারলি না তাঁকে, কেন তিনি এই বেশ ধারণ করেছেন ?

—আমাদের তা সাহস হলো না রাণীমা। আপনি যদি পারেন এর একটা বিহিত করুন।

— আচ্ছা দাঁড়াও তোমরা আমি এখুনি রাজার কাছে যাচ্ছি। তাঁকে নিরস্ত করছি।

এই বলে রাণী মায়া চলে এলেন নরকাসুরের কাছে। রাজা তখন আর রাজা নেই। তিনি পুরো সন্ন্যাসী। এবার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেই হয়। তারই জন্যে অপেক্ষা করছেন সন্ন্যাসীবেশী রাজা নরকাসুর। কখন সেই শুভলগ্ন আসবে যখন তিনি রাজ-প্রাসাদ হতে বহির্গত হয়ে চলে আসবেন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। তারপর নদের স্নিগ্ধ ও পবিত্র বারিধারায় অবগাহন করে বসবেন পিতামহ ব্রহ্মার তপস্যায়।

তপস্যার জন্যে রাজা নরকাসুর প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় রাণী মায়া এসে সেখানে দাঁড়ালেন। তিনি রাজার বেশবাস দেখে ভীত ও বিস্মিত হলেন। সেই সঙ্গে অদম্য কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করলেন রাজা নরকাসুরকে। নাথ! আমি কি জানতে পাবি কেন অপনি এই বেশ ধারণ করেছেন ?

—না কল্যাণী। তোমার কাছে এর কারণ বলতে পারি না। তুমি নারী। তোমার পক্ষে এ কথা শোনা উচিত হবে না। তবে এটুকু বলতে পারি আমি বেশ কয়েক বছর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত থাকবো না এর বেশী আর কিছু জানতে চেও না।

—কিন্তু—

—কিন্তু কি কল্যাণী ?

—আমার মন যে অনেক কিছু জানতে চায় নাথ। আমি এমন কি অপরাধ করেছি যার জন্যে আপনি আমাকে এ বিষয়ে কোন কথা জানাতে ইতঃস্তত করছেন ?

রাণী মায়ার কথা শুনে কটাক্ষ করলেন রাজা নরকাসুর। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, অপরাধ তুমি করো নি, আমি করেছি আর তাব প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি এই বেশ ধারণ করে চলেছি তপস্যায়।

এই কথা বলে দ্রুতপায়ে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন রাজা নরকাসুর। রাণী মায়া তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে থেমে গেলেন।

ব্রহ্মপুত্র নদে অবগাহন করে তার তীরে একটি কুটিরের মধ্যে অবস্থান করে ব্রহ্মার আরাধনায় প্রাণ মন সমর্পণ করলেন রাজা নরকাসুর। অত্যধিক নিষ্ঠা এবং কঠোর আচারের মধ্যে দিয়ে তাঁর নিত্যকার সাধন-ভজন চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এমনিভাবে দীর্ঘ একশো বছর অতিক্রান্ত হলো।

একদিন পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, হে সুব্রত! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি এবার বর প্রার্থনা করো।

রাজা নরক কমলাসনকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে তাঁর অর্চনা আরম্ভ করে দিলেন। তারপর তাঁর শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে বললেন, হে সুরজ্যেষ্ঠ! দেব, অসুর, রাক্ষস এবং সকল দেবযোনি এঁদের সকলের অবধ্য হবো এই বর আমাকে দিন। এছাড়া আরও কয়েকটি বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি। সেগুলি এইরূপ, যে পর্য্যন্ত সূর্য ও চন্দ্র জগৎকে প্রকাশিত করবে সেই পর্য্যন্ত আমি যেন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে কালযাপন করতে পারি। এছাড়া আর একটি বর হচ্ছে, তিলোত্তমাদির যেসব রূপ ও গুণ রয়েছে সেইসব রূপ ও গুণযুক্ত ষোড়শ সহস্র স্ত্রী হবে। আর একটি বর দিন যার বলে আমি সকলের অজেয় এবং শ্রীসম্পন্ন হয়ে সর্বদা ঐশ্বর্যের অপরিত্যক্ত হবো। আজ আপনি আমাকে এই বরগুলি প্রদান করুন।

মায়ায় মোহিত হয়ে নরকাসুর আসল প্রসঙ্গ বিস্মৃত হলেন।

সেই সময় তাঁর মনে ছিল না মুনিশাপের কথা। তাই অন্য বর প্রার্থনা করলেন। ফলে মুনিশাপ খণ্ডিত হলো না। পূর্ববৎ রয়ে গেল।

পিতামহ ব্রহ্মা বললেন, তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে। দ্বাপরের শেষভাগে তিলোত্তমাদির মত রূপবতী সন্ধ্যা নামে এক সুরকন্যা জন্মগ্রহণ করবে। যতদিন নারদ তোমার বজ্রধ্বজপুরে না যান ততদিন তুমি তার সঙ্গে সম্ভোগক্রিয়ায় বত হয়ো না।

এই কথা বলে সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা হলেন অদৃশ্য। রাজা নরক তখন ফিরে এলেন রাজধানীতে। আসার সময় কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে দর্শন দিয়ে এলেন।

অতঃপর প্রাসাদে ফিরে এসে রাজা দেখলেন তাঁর প্রাসাদ আগের মত হয়ে উঠেছে আনন্দময়। সকলের মুখে-চোখে প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দের হাসি। সকলের ঘরে ফিরে এসেছে শ্রী ও শান্তি।

রাজা নরকাসুব রাজধানীতে ফিরে এসেছেন এই সংবাদ রটে গেল চারদিকে। প্রজাবা আনন্দে বসবাস করতে লাগলো অনেকদিন পরে তাদের প্রিয় রাজাকে কাছে পেয়েছে বলে।

রাজা বাণ একদিন এলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা নরকাসুরকে দেখতে।

রাজা নরকাসুর অনেকদিন পরে রাজা বাণকে দেখে আনন্দলাভ করলেন।

বাণ মিত্র নরককে বললেন, কোথায় আপনি তপস্যা করেছেন? কিরূপ ব্রত প্রতিপালন করেছেন? কিরূপ বর লাভ করেছেন? সেসব আমাকে বলুন। আপনার নগর আনন্দপূর্ণ এবং জনসমাজও অত্যন্ত প্রফুল্ল। আপনি তাদের সুখশান্তিতে প্রতিপালন করছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। এখন আপনি আমাকে বলুন, কিভাবে আপনি ব্রহ্মার কাছ থেকে বরলাভ করলেন?

ভৌম বললেন, ব্রহ্মা স্বয়ং পর্বতরূপ ধারণ করে কামেশ্বরীকে

ধারণ করার জন্যে এখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যতক্ষণ বশিষ্ঠ আমাকে শাপ দেননি ততক্ষণ কামাখ্যা ধারণে স্বয়ং যত্ন করেছিলেন। হে বলিপুত্র! ব্রহ্মা আমার পুরে এই শ্রেষ্ঠ পর্বতে দেবাকুলসেব্য হয়েও বিরাজ করছেন। তারপর আমি জলগ্রহণ করে একশো বছর তপস্যা করলুম। সেই দীর্ঘ সময় আমার কাছে কিছুই মনে হলো না। একশো বছর সময় আমার কাছে এক বছরের মত মনে হলো। তারপর চতুরানন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে অনেক হিতকথা বললেন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি ঈপ্সিত বর গ্রহণ করো। আমি তখন কয়েকটি বর গ্রহণ করলুম। প্রথম বরে আমি সুরাসুর এবং দেবযোনি মাত্রের অবধ্য হবো। দ্বিতীয় বরে আমি কখনো অপুত্রক হবো না। তৃতীয় বরে আমি সকলের কাছে অজেয় হবো। চতুর্থ বরে আমি হবো অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর এবং পঞ্চম বরে আমি হবো অজস্র সুন্দরী স্ত্রীগণের পতি।

আমি ব্রহ্মার কাছে এই পাঁচটি বর প্রার্থনা করলুম। তিনিও আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারপর প্রত্যাগমন করলেন নিজের ভবনে। অতঃপর আমিও ফিরে এলুম আমার প্রাসাদে। বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ালুম এবং অনেক পণ্ডিতকে ধনরত্ন দান করলুম।

রাজা নরকাসুরের কথায় পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না রাজা বাণ। তিনি নরককে উৎকৃষ্ট বাক্য বলতে পারলেন না। তা না পারলেও নরকের আশু বিপদের কথা স্মরণ করে তিনি বন্ধুজনকে সামান্যমাত্র পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, হে মিত্র! আপনি ব্রহ্মার আরাধনা করে তাঁর কাছ থেকে বরলাভ করেছেন সত্যি কিন্তু তার জন্যে আপনার ওপর থেকে বিপদ কেটে যায় নি। ঋষির শাপ নষ্ট হয় নি। সামনে দেখতে পাচ্ছি আপনার বিপদ রয়েছে। সেই বিপদ হতে রক্ষা পেতে হলে আপনাকে অক্লান্ত পরিশ্রম

করতে হবে। মহাবীর সেনাপতিদের হাতে রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করুন। দেবতাদেরও দুর্জেয় বীরদের দ্বারীর পদে নিযুক্ত করুন। যদি দেবেশ্বরকে অতিক্রম করে আপনি বর লাভ করে থাকেন যে বর ব্রহ্মা আপনাকে দিয়েছেন তা পরীক্ষা করুন আর নিজের পুরে অবস্থান করে মায়ার গর্ভে সন্তান সৃষ্টি করুন।

এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে রাজা বাণ স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজা নরকাসুরও নিজের কাজে যুক্ত হলেন এবং রাজা বাণের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে ব্রতী হলেন।

এখন থেকে বাণেব কথামত চলতে লাগলেন রাজা নরকাসুর। স্ত্রী মায়ার গর্ভে তিনি চারটি পুত্র সন্তানেব জন্ম দিলেন। তাদের নাম যথাক্রমে ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবাণ এবং সুমালী। তারা দিন দিন মহা বীর্যশালী হয়ে উঠলো। এবপর রাজা নবকাসুর অনেক অনুসন্ধান করে হয়গ্রীব নামে অসুবকে নিয়ে এলেন। তাঁকে নিযুক্ত করলেন প্রধান সেনাপতি হিসাবে। হয়গ্রীবকে দেখে অন্যান্য অসুররাও এলো। সুরু নামে এক অসুব এসে রাজা নরকাসুরেব কাছে কর্মপ্রার্থী হলো। রাজা নরকাসুর তাকে অন্যান্য সৈন্যসহ রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দ্বারে নিযুক্ত করলেন। হয়গ্রীবকে করলেন উত্তর দ্বারের অধিপতি। উপসুন্দ নামে এক অসুব এসে রাজা নরকাসুরকে জানালো, মহারাজ! আপনি শুনলুম একাধিক অসুর সেনাপতিকে আপনার প্রাসাদেব দ্বারাধিপতি নিযুক্ত করেছেন। আমি একজন মহাবলশালী অসুর সেনাপতি। আপনি অবশ্যই আমার কথা এর আগে শুনে থাকবেন। আমি আপনার রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষী হতে চাই। আমাকে আপনার প্রাসাদের দ্বাররক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করুন।

রাজা নরকাসুর মাথা চুলকে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলেন অসুর সেনাপতি উপসুন্দের কথা। তারপর বললে, হ্যাঁ, আমি

তোমার কথা আগেই শুনেছি। তুমি আজ থেকে আমার রাজপ্রাসাদের পূর্বদ্বারের রক্ষী নিযুক্ত হও।

সেদিন থেকে উপসুন্দ পূর্বদ্বারের অধিপতি নিযুক্ত হলো।

এরপর অসুব বিরূপাক্ষকে নিযুক্ত করা হলো দক্ষিণ দ্বারের অধিপতি।

এভাবে বিভিন্ন অসুর সেনাপতিগণ একাধিক অসুর সৈন্য নিয়ে রাজা নবকাসুবেব রাজপ্রাসাদ সুবক্ষিত করলেন।

এখন থেকে রাজা নরকাসুবেব প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। বাজা নরকাসুর আগের সেই সুরভাব পবিত্যাগ কবে অসুরভাব গ্রহণ কবে দেবতাদেব ওপব নানাপ্রকার উৎপীড়ন করতে লাগলেন। এমন কি তাঁব অত্যাচাবের হাত হতে মুনিঋষিরাও পরিত্রাণ পেলেন না!

একদিন রাজা নরকাসুব অসুর সেনাপতি হয়গ্রীবেব সাহায্যে জয় করলেন দেববাজ ইন্দ্রকে। তিনি অসুবভাব বিস্তার করে অনায়াসে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। বাণের কথামত তিনি ইন্দ্র ও অসুবগণকে পীড়ন কবতে উদ্যত হলেন। তিনি কেবল দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত কবেন নি সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকদুর্লভ সর্বরত্নস্রাবী দুঃখ ও বিঘ্ন নিবারক অদিতির কুন্তল দুটি অধিকার করেন। এর জন্যে তিনি মুনিদের দেওয়া অভিশাপ গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

এভাবে ক্ষিতিপুত্র নরকাসুব দেবতা ও মুনিগণের উৎপীড়নে রত হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বাজত্ব করেন।

রাজা নরকসুরের অত্যধিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ধরিত্রী। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু প্রমুখ দেবতা-দের শরণাপন্ন হলেন। তাঁদের কাছে এসে তাঁদের চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে বললেন, যে দানবকে বাক্ষস ও দৈত্যদের, বিষ্ণু বিনাশ করেছিলেন তারা রাজা নরকের ঘরে জন্ম নিয়েছেন এবং

তারা অত্যন্ত বলবান। তাদের দুর্বহ ভার আমি সহ্য করতে পারছি না। তারা অসংখ্য। তাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করতে আমি সক্ষম হচ্ছি না। সেই অসুরদের মধ্যে আটশো হাজার প্রধান এবং অত্যন্ত বলবান। তার মধ্যে অত্যন্ত বলসম্পন্ন বলিপুত্র বাণ, বীর কংস, ধেনুক, অরিষ্ট, প্রলম্ব, মল্লচাণুর মুষ্টিক, মহাবলবান · জরাসন্ধ, নরক, হয়গ্রীব, নিসুন্দ, সুন্দ, বিরূপাক্ষ, পঞ্চজন, হিড়িম্ব, বক জটাসুর, নির্ম্মীর, অনায়ুধ, অলম্বুষ, শৌভাধক্ষ, জরাসন্ধ ও দ্বিবিধ বানর, শ্রুতায়ুধ, মহাদিত্য শতায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র সুবাহু, অতিবাহু, হিরণ্যপুর নিবাসী কালজ্ঞ প্রভৃতি দৈত্যবর্গের ভার আমি কিছুতেই সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছি না। এদের পদভারে নিয়ত ব্যথিত হয়ে চরম দুঃখ ভোগ করছি। আমার শরীর হয়েছে বিশীর্ণা। আমি এসব দৈত্যের ভার বহন করতে নিতান্ত অসমর্থ হচ্ছি। এদের দেবগণ বিনাশ করুন। তা না হলে আমি একেবারে বিশীর্ণা হবো কিংবা পাতালে প্রবেশ করবো।

ধরিত্রীর কাতর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলেন দেবগণ। তাঁরা ধরিত্রীকে আশ্বাসবাক্য শুনিয়ে বললেন, আমরা অবশ্যই তোমার ভার মোচন করবো। তুমি শান্ত হও।

এরপর সকল দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর কাছে এসে কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন, আপনি কৃপা করে ধরিত্রীর ভার মোচন করুন। আপনি কৃপা না করলে আর কে কৃপা করবে বলুন।

দেবতাদের আরাধনায় তুষ্ট হলেন ভগবান বিষ্ণু। তারপর তিনি দেবগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেবগণ। তোমরা নিজের নিজের রূপ ধারণ করে পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হও।

এইরূপ বলার পর স্বয়ং বিষ্ণু ভার অপনোদনের জন্য দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হলেন।

দেবগণ সনাতন হরি অবতীর্ণ হয়েছেন শুনে পৃথিবীতে রম্ভা

ও তিলোত্তমার মত রূপ ও গুণসম্পন্না যোড়শ সহস্র স্ত্রী উৎপাদন করলেন। তারপর সেই মনোহারিণী স্ত্রীগণ হিমালয়ের মত সুউচ্চ এক স্থানে খেলা করছে দেখে রাজা নরকের বড় লোভ হলো। তিনি চেয়েছিলেন এমনি সুন্দরী স্ত্রী উপভোগ করতে। এতদিনে বুঝি তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে।

তিনি কাউকে কিছু না বলে ঐ স্ত্রীলোকদের বাহুবলে পরাভূত করে তারপর তাদের নিয়ে যান প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। সেখানে নিয়ে গিয়ে রাজা নরক সুন্দরী স্ত্রীলোকদের নিকটে আহ্বান করেন এবং তাদের দেহসৌন্দর্য্য উপভোগ করার বাসনা জানান।

রাজা নরকাসুরের কথার উত্তরদান প্রসঙ্গে স্ত্রীগণ বললে, হে ভূমিপুত্র! নারদ এই নগরে যতদিন না আসেন ততদিন সম্ভোগ-স্পৃহা নিবৃত্তি করুন। যেহেতু তিনি আমাদের গুরু ও আমরা তাঁর রক্ষিতা। হে বীর! নারদ শীঘ্রই এই নগরে আসবেন। তাঁর আগমনকাল পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করে প্রতীক্ষা করুন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হলে তারপর আপনার সম্ভোগসুখ ভোগ করবো।

এভাবে তারা কিছু সময় প্রার্থনা করলে পৃথিবীপুত্র নরক সেই সময় ব্রহ্মবাক্য স্মরণ করে তাদের কথায় রাজী হলেন।

এর মধ্যে বিষ্ণু নন্দগৃহে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ধরাতলে অবতীর্ণ হলেন। তারপর কংস, কেশী ও প্রলম্বাদি দৈত্যদের বিনাশ করে সমুদ্রের কাছে দ্বারকাতে বাস করতে লাগলেন। তারপর সেই দ্বারকাতে মানুষের রূপধারী কৃষ্ণ কালিন্দী, রুক্মিণী, নগ্নজিৎকন্যা, সত্যা, লক্ষণা, চারুহাসিনী, শীলসম্পন্না সুশীলা ও জাম্ববতী এই আটটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই সময় বলদেব হন তাঁর সহায়। সেই কন্যাদের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত থেকে ভগবানের কয়েক বছর অতীত হলো। তারপর কৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি কয়েকটি বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। তারা অল্পকালের মধ্যে অস্ত্র-শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সকলের অজেয় হয়ে উঠলো।

দ্বারকাতে বেশ আনন্দে রাজকার্য্য চালাতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র নরকের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়ে অন্য দেবতাদের সঙ্গে চলে এলেন দ্বারকাতে। সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। দ্বারকায় আসতেই কৃষ্ণ তাঁকে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা জানালেন এবং বললেন, আপনাব জন্যে স্বর্ণসিংহাসন প্রস্তুত আছে। আপনি সেখানে উপবেশন করুন।

শ্রীকৃষ্ণের কথামত ইন্দ্রে স্বর্ণসিংহাসনে গিয়ে বসলেন। তারপর তিনি শত্রু নরকাসুরেব বৃত্তান্ত একের পর এক বলতে শুরু করলেন। নরক পূর্বে যা বলেছিলেন এবং বর্তমানকালে যা করছেন তা সমস্তই বললেন। আর বললেন, মহাবাহু কৃষ্ণ! আমি যেজন্যে আপনাব কাছে এসেছি সে সবই আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি দয়া করে শুনুন। তাতে কবে ভয় পাবেন না। সুবপীড়ক দুষ্ট ভূমিপুত্র নরক চিরজিবী হয়ে বিষ্ণু ও পৃথিবীকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়েছে। এসময়ে দুষ্ট নরক বিষ্ণু ও ক্ষিতিকে অবজ্ঞা করে বাণের কথামত ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছে। ব্রহ্মা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করেছেন। সেই বরে নরক হয়ে উঠেছে অজেয় এবং সর্বশক্তি-মান। এর ফলে সে মাধব ও ক্ষিতিকে কখনো স্মরণ করে না। সেই দুরাত্মা আগে ধর্মশীল, দেবারাধনায় রত এবং ব্রতশীল ছিল। বর্তমানে সে অসুরভাব ধারণ করে সকলকেই পীড়া দিচ্ছে। কেবল তাই নয়। মোহবশে অদিতির অমৃত-নিস্যন্দী কুন্তল দুটি হরণ করেছে। দেব ও ঋষিগণকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে ও ব্রাহ্মণদের অপ্রিয়কর্মে সর্বদা রত থেকে সে নিজের ইচ্ছামত আমাকেও পীড়া দিচ্ছে। সে অসুর ও দেবতাদের জেতা এবং দেবাদির অবধ্য হয়েছে। এখন আপনিই পারেন তার শক্তি হরণ করতে। অতএব সেই পাপাত্মাকে মঙ্গলের জন্যে বিনাশ করুন। আপনার জন্যে দেবগণ দেব ও গন্ধর্বকন্যাগণকে পর্বতপ্রধান হিমালয়ে রেখেছিলেন। সেই দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যা শতাধিক ষোড়শ সহস্র। সেইসব কন্যাদের

বলগর্বিত পাপিষ্ঠ নরক হয়গ্রীবের সহায়তায় অপহরণ করেছে। সাগরে, পৃথিবীতে এবং স্বর্গে যেসব রত্ন ছিল সে সবই দেবতা ও মানুষদের উৎপীড়ন করে আত্মসাৎ করে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মণিপর্বতে অলকাপুরী নামে একটি পুরী তৈরী করেছে। সেখানে বাস করছে সেইসব অপহৃতা দেব এবং গন্ধর্বকন্যাগণ। তারা সম্ভোগ বর্জিতা হয়ে একবেণী ধারণ করে আপনারই প্রতীক্ষা করছে। অতএব কৃষ্ণ! আপনি তাদের সনাথা করুন। সেই কন্যাগণ রাজা নরকাসুরকে এমন কথা বলেছে, 'ভূমিপুত্র! যতদিন নারদ মুনি আপনার নগরে না আসবেন ততদিন আমাদের সম্ভোগ-বিষয়ে আপনি বিরত থাকবেন'। এভাবে দেবকন্যারা সেই দুরাত্মা নরকের কাছে সময় প্রার্থনা করে তাকে সম্ভোগবিষয়ে নিবৃত্ত রাখে। যে সময় দেবর্ষি নারদ যাবেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ঠিক সেই সময় আপনিও সেখানে যাবেন নরককে বিনাশ কবতে। নরক ভয়াবহ পাপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। তার পাপভারে পৃথিবী বিষণ্ণা এবং শোকাতুরা। আপনি তাকে বিনাশ করলে পৃথিবীর মনে দুঃখ হবে না। ইতিমধ্যেই দেবী পৃথিবী নরককে বধ করবার জন্য বারংবার দেবতাগণের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। অতএব আপনি পাপিষ্ঠ নরককে বিনাশ করুন। তাকে বিনাশ করে স্ত্রী এবং মণিরত্নাদি উদ্ধার করুন।

ইন্দ্রের একান্ত প্রার্থনা মন-প্রাণ দিয়ে শুনলেন দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বললেন, বেশ আমি এখনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রওনা হচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি দুরাচারী নরককে উপযুক্ত শাস্তি দেবো। আপনি নিশ্চন্ত থাকুন দেবরাজ।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হলেন দেবরাজ। তিনি দ্বারকাপতিকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেলেন স্বর্গলোকে।

ওদিকে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে যাত্রা করলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অভিমুখে।

মহাদ্যুতি বিষ্ণু ও ইন্দ্র আকাশে যাত্রা করেছেন দেখে যাদবরা মনে ভাবলো সূর্য ও চন্দ্র বোধ হয় একত্র হয়েছে। তাঁদের দেখে অপ্সরাগণ ও গন্ধর্বগণ স্তব সুরু করলে। তারপর ক্ষণকাল মধ্যে উভয়ে হলেন অদৃশ্য।

তারপর ক্ষণকাল মধ্যেই জগৎপতি নরকের বশীকৃত প্রাগ্-জ্যোতিষপুর নামে নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন রাজা নরকাসুরের রাজধানী অসুরসৈন্য ও অসুর সেনাপতিদ্বারা সুরক্ষিত।

তিনি যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এসে পৌছলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন দেবর্ষি নাবদ নরকাসুরের রাজপ্রাসাদ হতে বহির্গত হচ্ছেন।

ইতিমধ্যে দেবর্ষি নরকাসুরের বাসভবনে এসে গেছেন। রাজা নরকাসুরও দেবর্ষিকে যথাসাধ্য সম্মান জানান। তারপর তিনি মুনির কাছে প্রস্তাব জানালেন, দেবর্ষি! আমার অলকাপুরীতে বহু সুন্দরী দেব এবং গন্ধর্বকন্যারা বাস করছে। আমি তাদের উপভোগ করতে চাই। আপনি আমাকে সম্ভোগের সময় বলে দিন।

রাজা নরকাসুরের কথা শুনে দেবর্ষি নারদ বললেন, আজ চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী প্রবৃত্ত হয়েছে। হে ধরাপুত্র! নবমীতে আপনার বিশেষ বিপদ। তারপর চতুর্দ্দশীতে এই স্ত্রীগণ যদি সুন্দররূপে ঋতুস্নাত হয় তাহলে আপনি এদের সঙ্গে সম্ভোগ করবেন।

দেবর্ষির কথা শুনে ভীত হলেন রাজা নরক। রাজ্যে বিপদের কথা স্মরণ করে তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। তাই নিজরাজ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য বাজ্যের মধ্যে অসুরসেনাপতি এবং রাক্ষস সৈন্য মোতায়ন করলেন।

ইতিমধ্যে রাজা নরকের কাছে সংবাদ এলো শ্রীকৃষ্ণ রাজ প্রাসাদের পশ্চিমদ্বার আক্রমণ করেছেন। যাটহাজার ক্ষুর নামে পাশসকল খণ্ড খণ্ড করেছেন।

ঐ খবর শুনে রাজা নরক প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য পাঠালেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই কররার জন্যে। কিন্তু সবই বৃথা হলো। তাঁর যুদ্ধকৌশলের কাছে পেরে উঠবে কে? একে একে মহারথী অসুর সেনাপতিগণ পরাজয় বরণ করলো। সুন্দ, নিসুন্দ, হয়গ্রীব, বিরূপাক্ষ প্রমুখ অসুররা আত্মসমর্পণ করলে। শ্রীকৃষ্ণ তাদের বন্দী করে নিধন করলেন। অতঃপর তিনি ইন্দ্রপুরীতুল্য রাজা নরকাসুরের পুরীমধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানেও রয়েছে আটশো হাজার অসুর সৈন্য। প্রবলযুদ্ধে তাদের তিনি বধ করলেন। তাঁর যুদ্ধকৌশল দেখে মনে হলো এ যেন দেবাসুরের সংগ্রাম। আকাশ হতে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

বহু অসুর বিনষ্ট করার পর শ্রীকৃষ্ণ এলেন রাজা নরকাসুরের কাছে।

যুদ্ধে সকল অসুরের পতন হয়েছে শুনে এবং মহাবাহু মহাবল-সম্পন্ন গরুড়ের পিঠে কৃষ্ণকে দেখে রাজা নরকাসুর বশিষ্ঠের শাপ এবং মাধবের প্রস্তাবিত নিয়ম স্মরণ করতে লাগলেন। ভাবলেন, তপোবলসম্পন্ন ঋষিকে ওভাবে অপমান করা ঠিক হয়নি। বোধহয় তাঁর শাপে আমার এই অধঃপতন ঘটেছে ও ঘটছে।

অসুরভাবাপন্ন নরকাসুরের মনে এই প্রকার অনুশোচনা এলেও তা ক্ষণকালমাত্র বর্তমান রইলো। পরক্ষণে তা সমুদ্রসৈকতে জল-বিন্দুর মত অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি পুনরায় নিজের আসুরিকভাবে মত্ত হয়ে প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করে রাজা নরকাসুরের অগণিত সৈন্যকে বধ করলেন।

যুদ্ধ করতে করতে রাজা নরকাসুর দেখতে পেলেন, রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ আর নেই। তার জায়গায় শোভা পাচ্ছেন কামাখ্যাদেবী। তিনি রণমূর্তি ধারণ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন নরকাসুরের সঙ্গে।

প্রথমে রাজা আশ্চর্য্য বোধ করলেন। পরে নিজেকে সংযত করে নিলেন। রীতিমত যুদ্ধ করতে লাগলেন কামাখ্যাদেবীর সঙ্গে। পরে দেবী পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁর সুদর্শন চক্রাঘাতে নরকাসুরের দেহ দ্বিখণ্ডিত হলো। তিনি ভূমিতে পড়ে গেলেন। চক্রছিন্ন ভূমিতে পতিত তাঁর দেহ বজ্রভিন্ন গৈরিক পর্বতের মত শোভা পেতে লাগলো।

পুত্র ভূমিতে পড়েছে দেখে ধরিত্রী তার কাছে ছুটে এলেন। ভাবলেন এবার তাঁর পুত্র পৃথিবী হতে চিরকালের মত বিদায় নেবে।

রাজা নরকাসুর ক্ষণকাল পরে অন্তিম নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। তাঁর কানে তখনো শোভা পাচ্ছিল অদিতির কুন্তলদ্বয়। মাতা ধরিত্রী সেই কুন্তলদুটি খুলে নিয়ে গোবিন্দকে উপঢৌকনস্বরূপ দান করলেন তারপর বললেন, আপনি বরাহ অবতারে যখন আমাকে উদ্ধার করেছিলেন সেই সময়ে আপনার সংস্পর্শে আমার গর্ভে নরকের উৎপত্তি হয়। তাকে এতদিন আপনি প্রতিপালন করেছেন। আজ যুদ্ধে তাকেই বিনাশ করলেন। সর্বকামদায়ী অদিতির এই কুন্তলদ্বয় গ্রহণ করুন। হে গোবিন্দ! এর সন্তানদের আপনি সর্বদা রক্ষা করুন।

ধরিত্রীর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেবী! তোমার ভার অপনোদনের জন্যে আমার কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করেছিলে। এই কারণে আমি তাকে বধ করেছি। দেবী! তোমার কথামত আমি এর সন্তানগণকে প্রতিপালন করব এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে দৌহিত্র ভগদত্তকে অভিষিক্ত করবো।

এইকথা বলে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন নরকভবনে। সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন, নরকের অন্তঃপুর নানারকম ধনরত্নে পূর্ণ। সেই ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে কারও ঐশ্বর্য্যের তুলনা হয় না। এমনকি সেরূপ ধনরত্ন কুবের, ইন্দ্র, যম ও বরুণের ভাণ্ডারে নেই।

শ্রীকৃষ্ণ নারদ ও পৃথিবীর সঙ্গে নরকভবনের বিভিন্ন ধনাগার

অবলোকন করলেন। তাদের মধ্যে কিছু কিছু মূল্যবান ধনরত্ন হস্তগত করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ নরকপুত্র ভগদত্তকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

ভগদত্তকে অভিষিক্ত দেখে পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানালেন, হে নাথ! ভগদত্তকে আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে ওর জীবন আমৃত্যু নির্বিঘ্ন থাকে এবং সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেবী! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। ভগদত্ত নির্বিঘ্নে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করবে। আমি ওকে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে দান করছি বৈষ্ণবী শক্তি যার বলে ও শক্তিমান হয়ে রাজ্যশাসন করতে পারবে।

এইপ্রকার কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগদত্তকে আশীর্বাদ করলেন।

একসময় রাজা নরকাসুর বরুণকে জয় করে যে স্বর্ণপ্রসূ ছাতা এনেছিলেন কৃষ্ণ নিজে তা গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি প্রচুর ধনরত্ন সমেত কয়েক হাজার হাতীকে পাঠিয়ে দিলেন দ্বারকা নগরীতে। নরক যেসব দেবকন্যাদের প্রাসাদে বন্দিনী অবস্থায় রেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাদের মুক্ত করলেন। এভাবে অনেককিছু প্রয়োজনীয় কাজ করার পর শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে ফিরে গেলেন দ্বারকাতে।

এককালে দেবী কামাখ্যার কৃপালাভ করে রাজা নরকাসুর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। পরে নিজের চারিত্রিক দোষে তিনি সবকিছু হারিয়ে নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হলেন।

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারতে মহাভারতীয় যুগ চলছিল। এই সময় নরকাসুরের রাজত্ব ছিল কামরূপ কামাখ্যায়। রাজা নরকাসুর দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন কামরূপে। তারপর তাঁর পতনের পর রাজা হন তাঁর পুত্র ভগদত্ত। ভগদত্ত ছিলেন রাজা যুধিষ্ঠীরের পিতা পাণ্ডুর বয়স্ক বন্ধু।

রাজা ভগদত্ত ছিলেন দ্রাবিড় রাজা। তাঁর আগে কামরূপে অর্থাৎ আসামে আর্যদের আক্রমণ ঘটে। আর্যরা সেখানে অনেক আগে থাকতেই বসবাস করতে থাকেন। নরকাসুর আর্যরাজা জনকের ঘরে লালিত-পালিত হন এবং পরে বিষ্ণুর আজ্ঞায় তিনি প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে অর্থাৎ আসামে এসে বসবাস করতে থাকেন। তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এসে স্থানীয় অনার্যজাতি কিরাতদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং কিরাতরাজ ঘটককে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের অধিকার হরণ করেন। তারপর থেকে আর্যরা প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে এসে নিরাপদে বসবাস করতে থাকে। আর্যরা আসামে আসার আগে সেখানে বাস করতো দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতীয় মানুষেরা। সেই কারণে অনেকে বলে কামাখ্যাপীঠ হচ্ছে অনার্যদের দেবী। আসলে একথা ঠিক নয়। সিন্ধু উপত্যকায় 'মহেঞ্জদরো' ও 'হরপ্পার' ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার পর দেখা গেল ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে প্রস্তরময় প্রাসাদ, জলনিষ্কাসন প্রণালী, বহুরকম পাত্র ও ভাস্করশিল্পের নিদর্শন। পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন এই পাথুরে প্রমাণ হতে শিবলিঙ্গ, বহু বৃষমূর্তি, যোনিপীঠ এবং বহু বিচিত্রমূর্তি আবিষ্কৃত হলো। ভারতের অনেক বিদ্বান, পণ্ডিত ও গবেষক এইসব আবিষ্কৃত বস্তুকে আর্যসভ্যতার নিদর্শন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। বৈদিক যুগ হতে শক্তিপূজার প্রচলন হয়ে আসছে এই ভারতে। ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত হতে স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বেশ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। অষ্টমন্ত্রাত্মক দেবী-সূক্তের ঋষি ছিলেন একজন মহিলা। তাঁর নাম বাক্। তিনি মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে নিজের আত্মারূপে অনুভব করে ঘোষণা করলেন, 'আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যা দেবী ও বিশ্বেশ্বরী'। ঋগ্‌বেদীয় রাত্রিসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন কুশিক। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্রও ঋগ্‌বেদে আছে।

আর্যরা ব্রহ্মকে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ভাবেই উপাসনা করেছেন। কারণ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ছিলেন একক। তারপর সৃষ্টিলীলা করার মানসে তিনি হলেন দুই অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী অর্থাৎ প্রকৃতি। তারপর উভয়ের মিলনে এলো বহু প্রজা। সুতরাং শিবলিঙ্গ এবং যোনিপীঠ হচ্ছে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীকচিহ্ন। এই দু'টি না হলে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। তাই সৃষ্টির আদি কাল হতে এই দুইয়ের আরাধনা প্রকাশ্যে ও গোপনে চলে আসছে এই স্বাভাবিক ধর্ম ছিল জগতে। সুতরাং আর্য অনার্য উভয় জাতিই শিবলিঙ্গ ও যোনি-পীঠের উপাসক ছিল একথা দিনের আলোর মত সত্য। শিবলিঙ্গকে যেমন সৃষ্টির আদি কারণ ও আদিবীজ বলা হয় তেমনি যোনি শব্দেও আদি কারণ বোঝায়। ঋগ্‌বেদে যোনি শব্দের প্রয়োগ অনেক জায়গায় দেখা যায়। দেবীসূক্তে 'মম যোনিরপ্সন্তঃ সমুদ্রে'—'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা রভমাণা ভুবলানি বিশ্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে তিনিই যে বিশ্বজননী শক্তিরূপা, তিনিই যে ইচ্ছামাত্রে ব্রহ্মাদি দেবতাদের জননী—'যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্' এটি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। সৃষ্টির কারণে যেমন ব্রহ্মা হয়েছিলেন প্রকৃতি তেমনি আমরা চণ্ডীর যুগে এলে দেখতে পাই অসুর বিনাশের জন্যে দেবতাদের মিলিত শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল দেবী দুর্গাকে। তাঁর শক্তিতে অসুর কুল বিনাশিত হলে ধরায় ও স্বর্গে শান্তি ফিরে এসেছিল। সুতরাং সর্বকর্মে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম হতে আরম্ভ করে স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি কর্মের মূলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আদিশক্তির অভিনব লীলা-বৈচিত্র। এই বৈচিত্র অনাদি অনন্তকাল হতে চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। দেব-দানব আর্য-অনার্য জাতি হতে আরম্ভ করে পৃথিবীর প্রতিটি জীবের মধ্যে আদ্যাশক্তির এই গূঢ় লীলা চলছে। সুতরাং যোনিপূজা যে কেবল অনার্যদের একচেটিয়া ছিল এমন কথা বলার কোন অর্থ হয় না। আর্য ও অনার্য উভয় জাতিই নিজেদের প্রয়োজনে তার

উপাসনা করেছে। কামরূপে যোনিপীঠের কাছাকাছি অনেক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে শিবলিঙ্গ, সৃষ্টির আদি বীজরূপে।

ভগদত্তের এক কন্যা ছিল। তার নাম ভানুমতী। তার সঙ্গে বিয়ে হলো কৌরব রাজপুত্র দুর্যোধনের। ভগদত্ত ছিলেন অসম-সাহসী এবং যোদ্ধা। বৃদ্ধ বয়সে অসীম বীরত্ব নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন কুরুক্ষেত্র মহাসমরে। তিনি ছিলেন কৌরবদের পক্ষে। কিন্তু প্রাণপণে সংগ্রাম করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। অর্জুনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীরাঘাতে শেষপর্যন্ত মৃত্যু মুখে পতিত হন। ভগদত্তের পুত্র পুষ্পদত্তও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মারা যান। তারপর পুষ্প-দত্তের ভাই বজ্রদত্ত হন কামরূপের রাজা। কেউ কেউ বলেন, বজ্রদত্ত ভগদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, ভাই ছিলেন। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের শাসনভার অনেকের হাতে পাল্টাপাল্টি হয়। বজ্রদত্তের পর কে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা হন এবং কতকাল রাজত্ব করেন তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও রাজা ভাস্কর বর্মণের তাম্রফলকের লিপি হতে জানা যায় যে বজ্রদত্তের মৃত্যুর তিন হাজার বছর পরে পুষ্যবর্মণ প্রাগজ্যোতিষপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাস্করবর্মণ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন। আর পুষ্যবর্মণ হচ্ছেন ভাস্করবর্মণের একাদশ পূর্বপুরুষ।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মে ও তান্ত্রিকধর্মে যে স্বৈরাচার ও দুর্নীতি দেখা গিয়েছিল তা ধীরে ধীরে অবসান হয়ে গেল। বৌদ্ধধর্মের সারাংশ চারদিকে প্রচারিত হলো এবং তার হৃদয়গ্রাহী মাহাত্ম্য শুনে দলে দলে লোকজন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্যও বেশীদিন স্থায়ী হলো না ভারতীয় জনগণের মনে। ঐ ধর্মেও নানারকম অনাচার ও দুর্নীতি প্রবেশ করলো। ফলে তান্ত্রিকধর্ম প্রবল হয়ে গ্রাস করলে বৌদ্ধধর্মকে। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্মও সুন্দর রইলো না দু'দিন বাদে সেও কালের নিষ্ঠুর শাসনে

দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠলো। তখন আচার্য্য শঙ্কর এলেন। তিনি ভারতের সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্য আবিষ্কার করে তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। বেদবিধি পুনরায় প্রবর্তন করেন। ভ্রষ্টাচার-পরায়ণ তান্ত্রিক কাপালিকদের যুক্তি তর্কে এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণে পরাজিত করেন। সেই সময় কামাখ্যার পুণ্যপীঠে বাস করেন এক কাপালিক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম ছিল অভিনব গুপ্ত। আচার্য্য শঙ্কর কামাখ্যায় এসে তাঁর সদাচারী তান্ত্রিক উপাসনা দেখে আনন্দিত হন। তাঁর চেষ্টায় কামাখ্যায় তন্ত্রধর্মের মাহাত্ম্য ও শক্তিপূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তার প্রভাবও প্রতিপত্তি অনেকখানি কমে গেছিল। এরপর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে কামাখ্যপীঠের মাহাত্ম্য বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে আর রইলো না জনগণের কাছে। একদিকে তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধধর্মের অনাচার অত্যাচার অন্যদিকে নয়া শঙ্কর বাদের প্রভাবে কামরূপ কামাখ্যার মাহাত্ম্য দিন দিন অবলুপ্তির পথে চললো। কালক্রমে তা মনুষ সমাজের বিস্মৃতির অন্তরালে অস্তমিত হলো। তার পরিণাম স্বরূপ কামরূপের পূণ্যপীঠ পরিণত হলো এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে। সেখানে গভীর অরণ্য এবং হিংস্র প্রাণীদের আবাসস্থল হয়ে উঠলো। কিন্তু স্থানীয় পার্বত্য অধিবাসীদের কাছে এই স্থান ছিল পবিত্র এবং পুণ্যময়। অনেকে প্রতি সন্ধ্যায় ঐ ধ্বংসস্তূপে ধূপধুনা জ্বালাতো, প্রদীপ দেখাতো,, অনেকে আবার ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে মনের অর্ঘ্য নিবেদন করতো। তার দ্বারা তারা শান্তি পেত। এভাবে কামাখ্যার পুণ্যপীঠ অনেকের কাছে অজ্ঞাত রইলো আবার অনেকের কাছে গুপ্তভাবে জ্ঞাত থেকে গেল। এরপর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে অনেক রাজা রাজত্ব করেছেন বটে কিন্তু কেউ-ই কামরূপ কামাখ্যার যোনীপীঠ প্রসঙ্গে মাথা ঘামান নি এবং তা জানবার বা আবিষ্কার করবার কৌতূহলও প্রকাশ করেন নি। তবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের কুচরাজা বিশ্বসিংহ কর্তৃক কামরূপের যোনীপীঠ পুনরুদ্ধার

হয়। সে এক অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী। সে প্রসঙ্গ পরে বলছি। তার আগে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের একটা ধারাবাহিক তালিকা এখানে উদ্ধৃত করছি। রাজা নরকাসুরের মৃত্যুর পর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্যান্য কয়েকজন রাজাদের রাজত্বকাল সঠিক-ভাবে জানা যায় না। ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা যতদূর জানা গেছে তাতে আনুমানিক ভাবে বলা যেতে পারে যে পুষ্যবর্মণের রাজত্বকাল ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে শুরু হয়। পুষ্যবর্মণের পর থেকে আরম্ভ করে রাজা নরনারায়ণ পর্য্যন্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল নিম্নে প্রদত্ত হলো।—

পুষ্যবর্মণ বংশের রাজাদের নাম ও রাজত্বকাল :—

রাজাদের নাম		রাজত্বকাল	
পুষ্যবর্মণ	আনুমানিক	৩৮০—৪০০	খৃষ্টাব্দ
|			
সমুদ্রবর্মণ	”	৪০০—৪২০	”
|			
বলবর্মণ—১	”	৪২০—৪৪০	”
|			
কল্যাণবর্মণ	”	৪৪০—৪৬০	”
|			
গণপতিবর্মণ	”	৪৬০—৪৮০	”
|			
মহেন্দ্রবর্মণ	”	৪৮০—৫০০	”
|			
নারায়ণবর্মণ	”	৫০০—৫২০	”
|			
মহাভূতবর্মণ	”	৫২০—৫৪০	”
|			
চন্দ্রমুখবর্মণ	”	৫৪০—৫৬০	”
|			

রাজার নাম		রাজত্বকাল	
স্থিতবর্মণ	"	৫৬০—৫৮০	"
স্থস্থিতবর্মণ (মৃগাঙ্ক)	"	৫৮০—৬০০	"
ভাস্করবর্মণ (কুমার)	"	৬০০—৬৫০	"
অবন্তীবর্মণ	"	৬৫০—৬৫৫	"

এরপর নতুন বংশের রাজত্বকাল হলো সুরু—

সলস্তম্ভ	আনুমানিক	৬৫৫—৬৭৫	খৃষ্টাব্দ
বিজয়া	"	৬৭৫—৬৮৫	"
পলাকা	"	৬৮৫—৭০০	"
কুমার	"	৭০০—৭১৫	"
বজ্রদেব	"	৭১৫—৭৩০	"
শ্রীহর্ষবর্মণ দেব	"	৭৩০—৭৫০	"
বলবর্মণ (২)	"	৭৫০—৭৬৫	"

এরপর কয়েক বছর অন্য কোন রাজাদের কথা জানা যায় না। তবে ৮০০ শতাব্দী হতে আবার অন্যান্য রাজারা রাজত্ব করেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। তাঁদের নাম ও রাজত্বকাল নিম্নে প্রদত্ত হলো।—

রাজার নাম		রাজত্বকাল	
চক্র আরথি (ইনি রাজত্ব করেন নি)			
প্রলম্ভ	আনুমানিক	৮০০—৮২০	খৃষ্টাব্দ
হর্জ্জারবর্মণ		৮২০—৮৩৫	"

রাজার নাম		রাজত্বকাল	
বনমলবর্মণ	”	৮৩৫—৮৬০	”
|			
জয়মালবর্মণ (বীরবাহু)	”	৮৬০—৮৭৫	”
|			
বলবর্মণ (৩য়)	”	৮৭৫ -৮৯০	”

এরপর কিছুদিন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসন শূন্য থাকে। তারপর রাজা হন ত্যাগ সিংহ।

রাজার নাম		রাজত্বকাল	
ত্যাগ সিংহ	আনুমানিক	৯৭০—৯৮৫	খৃষ্টাব্দ

এরপর নতুন বংশের রাজত্বকাল সুরু হলো। এই রাজবংশের নাম হলো ব্রহ্মপাল বংশ।

রাজার নাম		রাজত্বকাল	
ব্রহ্মপাল	আনুমানিক	৯৮৫—১০০০	খৃষ্টাব্দ
|			
রত্নপাল	”	১০০০—১০৩০	”
|			
পুরন্দর পাল (রাজত্ব করেন নি)			
|			
ইন্দ্রাপল	”	১০৩০—১০৫৫	”
|			
গোপাল	”	১০৫৫ -১০৭৫	”
|			
হর্ষপাল	”	১০৭৫—১০৯০	”
|			
ধর্মপাল	”	১০৯০—১১১৫	”
|			
জয়পাল	”	১১১৫—১১২৫	”

পালবংশ ধ্বংশের পর নিম্নলিখিত রাজারা রাজত্ব করেন কামরূপে।

রাজার নাম		রাজত্বকাল	
তিঙ্গদেব	আনুমানিক	১১২৫—১১৩১	খৃষ্টাব্দ
বৈদ্যদেব	”	১১৩১—১১৫০	”
পৃথু	”	১২০০ ১২২৮	”
সন্ধ্যা	”	১২৫০	”

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পর্যান্ত কামরূপের ওপর বক্তিয়ার, নাসিরুদ্দিন, মালিক উজ্‌বুক প্রমুখ মুসলমান শাসকদের আক্রমণ চলে। তারা চেয়েছিল কামরূপের স্বাধীনতা হরণ করে হিন্দু রাজাদের বশীভূত করে কামরূপে রাজত্ব করবে। কিন্তু তাদের সে আশা অচিরে বিলুপ্ত হলো। হিন্দু রাজারা বীর-বিক্রমে প্রায় দুশো বছর ধরে কামরূপের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মুসলমান শাসকদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং তাদের পরাস্ত করেন।

রাজার নাম		রাজত্বকাল	
সন্ধ্যা	আনুমানিক	১২৫০—১২৭০	খৃষ্টাব্দ
সিন্ধু		১২৭০—১২৮৫	"
রূপ	"	১২৮৫ - ১৩০০	"
সিংহধ্বজ		১৩০০—১৩০৫	"
প্রতাপধ্বজ	"	১৩০৫—১৩১৫	"
ধর্ম নারায়ণ	"	১৩২৫ - ১৩৩০	"
দুর্লভ নারায়ণ	"	১৩৩০ --১৩৫০	"
ইন্দ্র নারায়ণ	"	১৩৫০—১৩৬৫	"
অরি মত্তা	"	১৩৬৫—১৩৮৫	"
সুকরঙ্ক	"	১৩৮৫—১৪০০	"
সুতরঙ্ক	"	১৪০০—১৪১৫	"
মৃগাঙ্ক	"	১৪১৫—১৪৪০	"
নীলধ্বজ (খানবংশ)	"	১৪৪০—১৪৬০	"
চক্রধ্বজ	"	১৪৬০—১৪৮০	"
নীলাম্বর	"	১৪৮০—১৪৯৮	"

পঞ্চম শতাব্দীতে আলাউদ্দীন হোসেনসাহ কর্তৃক কামরূপ আক্রান্ত হয়। পরে হিন্দু রাজারা তাকে পরাজিত করে।

রাজা নীলাম্বরের পর বিশ্বসিংহ কামরূপের রাজা হন। বিশ্বসিংহের পর নবনারায়ণ সিংহাসনে আরোহন করেন। এঁরা ছিলেন কুচ রাজা। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নরনারায়ণ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে কামরূপের সিংহাসনে আরোহন করেন।

বিশ্বসিংহের পিতার নাম হরিয়া মণ্ডল। তিনি ছিলেন গ্রামের একজন মোড়ল। বৈষয়িক অবস্থা খুব ভাল না হলেও একেবারে গরীব ছিলেন না। মোটামুটি বৈষয়িক অবস্থা ভালই ছিল। হরিয়া মণ্ডলের দুই স্ত্রী ছিল। একজনের নাম হীরা আর অন্যজনের নাম জীরা। বিশ্বসিংহ হচ্ছেন হীরার সন্তান আর শিবসিংহ বা শিষ্যসিংহ হচ্ছেন জীরার সন্তান।

বিশ্বসিংহের বয়েস যখন কম ছিল যখন কামরূপ আক্রমণ করেন গৌড়ের তৎকালীন নবাব হোসেন শাহ। তিনি রাজা নীলাম্বরকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তারপর স্থানীয় ভুইঞাগণ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই সুযোগ হরিয়া মণ্ডলও ত্যাগ করলেন না। তিনিও উঠেপড়ে লাগলেন যেমন করে হোক তাঁর পুত্র বিশ্বসিংহের জন্যে অন্ততঃ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করবেন। তাই বিশ্বসিংহও পিতার সঙ্গে নানারকম রাজনৈতিক লীলায় জড়িত হয়ে পড়লেন। স্থানীয় ছোটবড় বিভিন্ন ভুইঞাদের সঙ্গে লাগলো তাঁর সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন বিশ্বসিংহ। তিনিই উপবেশন করলেন কামরূপের সিংহাসনে। প্রজারা তাঁকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা দেখাতে লাগলো। তাদের কাছে তিনি ছিলেন শিবের অবতারস্বরূপ। তখনকার দিনে কামরূপের রাজাকে বলা হতো এক একটি দেবতার প্রতিভূ। কেউ শিব, কেউবা বিষ্ণু। বিশ্বসিংহ ছিলেন শিবের প্রতিভূ।

বিশ্বসিংহ অতিশয় ধার্মিক ও দয়াবান রাজা ছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেন। কনৌজ থেকে একদল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কামরূপে নিয়ে আসেন। তাঁর আমলে প্রজারা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতো। বিশ্বসিংহের তুলনায় শিষ্যসিংহ ছিলেন অধিকতর ধার্মিক এবং একান্ত ভক্ত। অনেক সময় বিশ্বসিংহের মনে দেবতার প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতো কিন্তু শিষ্যসিংহের মনে কখনো দেবতার প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ জাগে নি।

এই বিশ্বসিংহের আমলে কামরূপ কামাখ্যার লুপ্ত তীর্থ আবার লোকমানসে জেগে ওঠে। তিনি দৈবক্রমে সন্ধান পেয়ে যান একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ কামরূপ কামাখ্যার যেখানে পার্বতীর যোনিমণ্ডল নিপতিত হয়েছিল।

কামরূপের বিভিন্ন জায়গায় ভূইঞাদের বা অহোমদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায়ই লিপ্ত থাকতে হতো বিশ্বসিংহ এবং শিষ্যসিংহকে। একবার নৈশযোগে শত্রু শিবির আক্রমণ করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললেন বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ তাদের সৈন্যবাও হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ। তখন বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ সৈন্যদের খুঁজতে এলেন নীলাচল পর্বতে। তারপর নরকাসুরের তৈরী পথে পাহাড়ের ওপর এসে পৌঁছান। এখানে এসে তারা অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন। তাদের দেহও হয়ে উঠলো অবসন্ন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাঁরা পথ চলতে অক্ষম হন। ওদিকে ঘন অন্ধকার চারদিকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়িয়েছে যে সামনে এক পা এগুতে গেলে হোঁচট খাবার উপক্রম হচ্ছে। নিজের হাতকেও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে না। এই দুঃসহ অসহায় অবস্থায় বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ উভয়েই অন্তরে অন্তরে এক দিব্য অনুভূতি উপলব্ধি করলেন। বিশ্বসিংহ বুঝতে পারলেন, কে যেন তাঁকে সামনের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তাকে অনুসরণ করে তাঁরা এলেন এক 'বটগাছের তলায়। সেখানে দেখলেন, এক বৃদ্ধা বটগাছের

তলায় বসে পূজায় রত। বৃদ্ধাকে দেখে দুই ভায়ের মুখে আশা ও আনন্দ প্রকাশ পেল। তাঁরা উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধাকে, আচ্ছা, এখানে কোথায় জলের সন্ধান পাওয়া যায় বলতে পারেন ?

তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন তার অনতিদূরে শোভা পাচ্ছে পাহাড়ী ঝর্ণা। স্থানটি অন্ধকার থাকার জন্যে তাঁরা ঝরণাটি দেখতে পাচ্ছেন না। তাই বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করলেন।

উত্তরে বৃদ্ধা বললেন, ঐতো তোমাদের কাছাকাছি রয়েছে ঝর্ণা। তোমরা ইচ্ছা করলে ওর পবিত্র ও শীতল বারি পান করতে পারো।

বৃদ্ধার কথায় বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ এগিয়ে গেলেন। খানিক দূর গিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন একটি ঝর্ণা রয়েছে।

তাদের পিপাসিত নয়ন-মন তৃপ্তি পেল বহু প্রতিক্ষার পর যখন মিললো জলের ক্ষীণরেখা। তখন দুই ভাই সবকিছু ভুলে গিয়ে অঞ্জলিভরে জলপান করলেন। জলপান করার পর তৃপ্তি বোধ করলেন।

জলপান করার পর বিশ্বসিংহ বললেন বৃদ্ধাকে, আপনি এখানে বসে কার উদ্দেশ্যে পূজার্চনা করছেন ?

বৃদ্ধা বিস্ময়ভরা নয়নে তাকালেন বিশ্বসিংহের মুখপানে। তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন, ওমা, এও জানো না। ঐ যে সামনে দেখতে পাচ্ছ একটা বিরাট স্তূপ ওরই মধ্যে সুপ্ত রয়েছেন একান্ন পীঠের এক পীঠ। সতীদেবীর এক অংশ ওখানে পড়েছে। আমরা ভক্তি করে ঐ স্তূপের আরাধনা করে থাকি। উনিই হচ্ছেন আমাদের আরাধ্য দেবী। আমরা ওর কাছে যাই চাই না কেন উনি কৃপা করেন।

বৃদ্ধার কথা শোনামাত্র রাজা বিশ্বসিংহের মনে বহে চললো আনন্দের স্রোতস্বিনী। তিনি তখন বলে উঠলেন উৎসাহভরে,

আমাদের সৈন্যরা এখানে আসার পর বিছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা দেবীর কাছে প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে পুনর্বার মিলিত হতে পারি।

বৃদ্ধা সকৌতুক হাসি মুখমণ্ডলে প্রকাশ করে বললেন, নিশ্চয়ই পাবে। এই দেবী হচ্ছেন জাগ্রত। এঁর কাছে যে যা মনস্কামনা করে তা পূর্ণ হয়।

বৃদ্ধাব কথা শুনে পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে বসে গেলেন দেবীর অর্চনায় রাজা বিশ্বসিংহ এবং শিষ্যসিংহ।

অতঃপর দেবীর কৃপায় অল্পক্ষণেব মধ্যে তাদের সৈন্যগণ পুনবায় মিলিত হলেন তাঁদের সঙ্গে। তাই দেখে সিংহভ্রাতৃদ্বয়ের ভক্তি জাগলো দেবীর প্রতি। তারা মনে মনে স্থির করলেন যদি কোনদিন তেমন সুযোগ ও সুবিধা আসে তাহলে তাঁরা দেবীর ঐ পীঠস্থানে গড়ে তুলবেন একটি স্বর্ণমন্দির।

ইতিমধ্যে রাজা বিশ্বসিংহ দেখলেন, তাদেব সামনে যে বৃদ্ধাটি ছিল তিনি আর সেখানে নেই। অদৃশ্য হয়েছেন। রাজা তখন কৌতূহলী মন সৈন্যদের সাহায্যে পাবত্য পরিবেশে ঘনঘোর অরণ্যের মাঝে বিচরণ কবতে লাগলেন বৃদ্ধাকে খুঁজে বের করার আশা নিয়ে। কিন্তু তাঁর সর্বপ্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি খুঁজে পেলেন না বৃদ্ধাকে। ভাবলেন, এই গভীর অরণ্যের মাঝে কেউ তো বাস করে না। তাহলে এখানে বৃদ্ধা কিভাবে এলেন? দেবী স্বয়ং আসেন নি তো!

এইরকম চিন্তা করে রাজা বিশ্বসিংহ পুনরায় এলেন ঝর্ণাব ধারে। এখানে এসে তিনি তাঁর হাতের হীরের আংটিটি ফেলে দেন। আংটির সঙ্গে বেঁধে দিলেন তিনফলাযুক্ত ছোট একটি লোহার নল। আংটিটি জলে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ভাবলেন, দেবী যদি সত্যিই জাগ্রত হন তাহলে আমি এই আংটি পুনরায় ফিরে পাবো বারাণসী ঘাটে।

এরপর রাজা দলবল নিয়ে ফিরে এলেন রাজধানীতে। তারপর এক শুভদিন দেখে তিনি রওনা হলেন বারানসী অভিমুখে। সেখানে বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাটে অবগাহন করে তারপর সেই আংটির অনুসন্ধানে রত হন। খানিকক্ষণ অনুসন্ধান কার্য চালাবার পর রাজা ফিরে পেলেন সেই হারানো আংটি। ভাল করে দেখলেন, লোহার ফলকের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে সেই আংটি।

আংটি পেয়ে রাজা বিশ্বসিংহের মনে আনন্দ আর ধরে না। অকস্মাৎ রাজা অনুভব করলেন তাঁর পেছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, কামরূপে ঝর্ণার ধারে যে বৃদ্ধাকে দেখেছিলেন ইনি সেই বৃদ্ধা। একেবারে একরকম দেখতে।

রাজাকে দেখে বৃদ্ধা সহাস্য মুখে প্রশ্ন করলেন, আংটি ফিরে পেয়েছ তো বাবা ?

রাজা সবিনয়ে বললেন, হ্যাঁ।

এরপর রাজা বিশ্বসিংহ তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতে যাবেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, সেই বৃদ্ধাটি তাঁর সামনে উপস্থিত নেই। তখন তিনি ভাবলেন, এ কি হলো ? সেই ছলনাময়ী বৃদ্ধাটি গেলেন কোথায় ? তিনি অনুচর পাঠালেন কাশীসহরের মধ্যে থেকে বৃদ্ধাকে খুঁজে বের করাব জন্যে। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা বৃথাই হলো।

রাজা তখন ফিরে এলেন কামরূপে। রাজ্যে ফিরে এসেও সুস্থির হতে পারলেন না তিনি। কামরূপে দেখা সেই রহস্যময়ী বৃদ্ধার প্রকৃত পরিচয় এবং ঝর্ণার ধারে সেই স্তূপটির রহস্য সন্ধানের জন্যে রাজপণ্ডিতদের আহ্বান জানালেন।

একদিন রাজপণ্ডিতগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে বহুপ্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং আলোচনা করলেন। তাঁরা সমবেত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, এই নীলকূট পাহাড় সামান্য নয়। এরই নাম নীলাচল পর্বত। আর যে স্তূপ রাজা বিশ্বসিংহ প্রত্যক্ষ করেছেন সেটি হচ্ছে

একান্ন পীঠের অন্যতম এক পীঠ। এর নাম কামাখ্যার শক্তিপীঠ। একসময় কামদেব এই দেবীমন্দির তৈরী করেন স্বর্গের বাস্তুকার বিশ্বকর্মাকে দিয়ে। পরে তা ধর্মবিপ্লবের পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এরপর দৈত্যরাজ নরকাসুর মা কামাখ্যার মন্দির নির্মাণ করে দেন। কিন্তু রাজা নরকাসুর এমনি দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন রাজ্যের প্রজাদের ওপর সে তাঁকে দেবী যেটুকু আগে কৃপা করেছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেন। ফলে অধর্মের প্রভাবে রাজা নরকাসুর রাজৈশ্বর্য্য হতে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ঐ পতনের মূলে ছিল মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপ। তিনি রাজা নরকাসুরের দুর্ব্যবহার ও অধর্ম আচরণ বরদাস্ত করতে না পেরে শাপ দিয়েছিলেন। রাজা নরকাসুরের পতনের পর থেকেই কামরূপ থেকে দেবী কামাখ্যার মাহাত্ম্যও লুপ্ত হয়ে গেল।

রাজজ্যোতিষী এবং রাজপণ্ডিতদের কথা শুনলেন রাজা বিশ্বসিংহ। তাঁর তখন মনে পড়ে গেল দেবীর পীঠস্থানে তাঁর মনোবাসনার কথা। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁর ছত্রভঙ্গ সৈন্যরা একত্রে মিলিত হলে তবে তিনি বুঝতে পারবেন শক্তিপীঠের মাহাত্ম্য। পরে তাঁর মনোবাসনা সফল হতে দেখে তিনি স্থির করলেন দেবী কামাখ্যার জন্যে তৈরী করে দেবেন একটি স্বর্ণমন্দির।

এবার তিনি দলবল নিয়ে নীল পর্বতের ওপর ছাউনি ফেললেন। চাপা পড়া মাটি পাথর সরিয়ে স্তূপ খননের আয়োজন করা হলো। অনেকক্ষণ খোঁড়ার পর রাজা বিশ্বসিংহ দেখতে পেলেন অনেক নীচে রয়েছে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। আর মূল পীঠটি তাতেই ঢাকা পড়ে গেছে। এই আবিষ্কার করার ফলে রাজার মনে আর আনন্দের সীমা রইলো না। তিনি বললেন, এখানেই গড়ে তোল দেবীর মন্দির। পুরোণো ভিতের ওপর থেকেই মন্দির নির্মাণ করা হোক।

রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করে রাজমিস্ত্রীরা লেগে গেল মন্দির

তৈরী করতে। স্থির হলো, ইট আর পাথর দিয়ে মায়ের মন্দির নির্মাণ করা হবে।

শিম্ভ্যসিংহ যখন জানতে পারলেন, রাজা বিশ্বসিংহ সোনার মন্দির তৈরী না করে সামান্য ইট ও পাথর দিয়ে মন্দির তৈরী করবার আদেশ দিয়েছেন তখন তাঁর মন বেঁকে বসলো। তিনি বিষণ্ণ মনে চলে এলেন রাজার কাছে।

ভাইকে বিষণ্ণ থাকতে দেখে রাজা বিশ্বসিংহ প্রশ্ন করলেন, আজ তোমাকে এমন বিষণ্ণ কেন দেখছি ?

উত্তরে শিম্ভ্যসিংহ বললেন, তার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি যদি কোন অপরাধ না নেন তো বলি .

ভাইয়ের কথা শুনে বিশ্বসিংহ বললেন, বেশ তোমার বক্তব্য প্রকাশ করো।

বড় ভাইয়ের কাছ থেকে ভরসা পেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন শিম্ভ্যসিংহ, আপনি দেবীর পীঠস্থানে এক সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দেবীর জন্যে আপনি গড়ে তুলবেন একটি সোনার মন্দির। কিন্তু আপনি তা তুলছেন না। সোনার মন্দিরের বদলে আপনি নাকি আদেশ করেছেন ইট আর পাথরের মন্দির নির্মাণ করতে।

ভাই শিম্ভ্যসিংহের কথা শুনে গম্ভীর স্বরে বললেন রাজা বিশ্বসিংহ. তোমার কথা সত্যি ভাই। আমি ঠিকই আদেশ করেছি। মায়ের মন্দির গড়ে তোলা হবে ইট ও পাথর দিয়ে। সোনা দিয়ে তৈরী করবো বলেছিলুম বটে কিন্তু এখন দেখছি যে অতো সোনা আমার রাজকোষে নেই। তাই সোনার বদলে ইট আর পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছি।

কিন্তু তাতে কবে আমাদের দেবীর কাছে কি অপরাধ হবে না ? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন শিম্ভ্যসিংহ।

রাজা বিশ্বসিংহ বললেন, আমার মনে হয় আমি ঠিক কাজই করছি শিম্ভ্যসিংহ। এতে করে আমাদের পক্ষে কোন অপরাধ হবে না।

—কিন্তু আমার মন যে সায় দিচ্ছে না আপনার কাজে।

—তা আমি কি করবো বলো। রাজকোষ শূন্য হলে আমার পক্ষে রাজত্ব চালানো দায় হয়ে উঠবে।

—আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখুন। দরকার হলে রাজ্যের ব্যয়ের অংশ কিছু কমিয়ে দিতে হবে।

—না শিষ্যসিংহ তা হয় না। আমি অনেক ভেবেচিন্তে তবে একাজে হাত দিয়েছি। আমার পক্ষে এ কাজের জন্যে দ্বিতীয়বার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

তবু শান্ত হতে পারলেন না শিষ্যসিংহ। তিনি রাজা বিশ্বসিংহের কাছে পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানালেন তাঁর মত পরিবর্তন করতে।

রাজা বিশ্বসিংহ নিজের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত অচল অটল রইলেন। শিষ্যসিংহ ফিরে গেলেন বিষণ্ণ মনে। সেইদিন রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে থাকবার সময় স্বপ্ন দেখলেন রাজা বিশ্বসিংহ, লাল কাপড়ে দেহ আবৃত করে একজন কুমারী এসে বসেছেন রাজা বিশ্বসিংহের মাথার কাছে। তিনি বলছেন রাজাকে, আমি দেবী কামাখ্যা। আমার জন্যে তুই সোনার মন্দির তৈরী করে দিবি বলেছিলি। কিন্তু তাতো দিলি না। আমার জন্য ইট ও পাথর দিয়ে মন্দির তুলছিস কেন?

রাজা দেবীর কথা শুনে করযোড়ে বললেন, মা, আমার রাজকোষে অতো সোনা নেই। আমি কিভাবে তোমার জন্যে সোনার মন্দির তৈরী করবো? আমার এই অক্ষমতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

দেবী তখন সন্তানের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে নিয়ে তাকে ক্ষমা করলেন পরে বললেন, বেশ তুই যদি আমার জন্যে সোনার মন্দির তৈরী করতে না পারিস তাহলে প্রতিটি ইটের সঙ্গে একরতি করে সোনা দিয়ে আমার জন্যে মন্দির তৈরী কর।

এইরূপ আদেশ দিয়ে দেবী হলেন অদৃশ্য। পরদিন শয্যাত্যাগ

করতেই রাজা দেখলেন তাঁর সামনে শিষ্যসিংহ এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখমণ্ডল আগের তুলনায় আরও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

রাজা বিশ্বসিংহ প্রশ্ন করলেন, এতো সকালে কি মনে করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে শিষ্যসিংহ ?

শিষ্যসিংহ বললেন, বড়ই ত্বঃসংবাদ সঙ্গে করে এনেছি দাদা।

—কিসের ত্বঃসংবাদ ভাই ?

—ইট ও পাথর দিয়ে দেবীর মন্দির গাঁথা হচ্ছিল। কিন্তু যতবার গাঁধতে যাবে মিস্ত্রী ততবার তার হাত থেকে ইট ও পাথর পড়ে যেতে লাগলো। বারবার এরকম ব্যাপার ঘটতে দেখে মিস্ত্রীবা মন্দির তৈরী করা ত্যাগ করেছে।

—এখন তাহলে কি উপায় ?

—আমার মনে হয় দেবীর স্থানে নিশ্চয়ই আমাদের কোন অপরাধ হয়েছে।

এই কথা বলে রাজা বিশ্বসিংহের দিকে চিন্তামগ্ন চাউনি নিয়ে তাকালেন শিষ্যসিংহ। দেখলেন, রাজা বিশ্বসিংহও চিন্তাকাতর। তাঁর তু'নয়নের পাদদেশে জমে উঠেছে অনিদ্রাজনিত কৃষ্ণবর্ণের প্রচ্ছায়া।

ক্ষণকাল নীরব থেকে রাজা বিশ্বসিংহ চিন্তা করলেন। তারপর নিজের ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুল মাথার চুলের মধ্যে সঞ্চালন করে ধীরে ধীরে বললেন, তোমার অনুমান ঠিক শিষ্যসিংহ। দেবীর কাছে সত্যিই আমাদের অপরাধ হয়েছে। আমি বলবো না, আমার অপরাধ হয়নি। তার কারণ আমি একবার প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে দেবীর মন্দির তৈরী করা হবে সোনা দিয়ে। তা না করে আমি ইট ও পাথর দিয়ে মন্দির তৈরী করার আদেশ দিয়েছি। এর ফলে আমি দেবীর কাছে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।

একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগলেন রাজা বিশ্বসিংহ, গতকাল রাত্রিবেলায় দেবী স্বপ্নে আমাকে সেকথা জানিয়েছেন। আমি তাঁর

জন্যে সোনার মন্দির তৈরী করে দিই নি বলে দেবী আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। পরে আমি দেবীকে আমার অক্ষমতার কথা জানাতে তিনি আদেশ দিলেন, আমি ইট ও পাথরের মন্দিরই তৈরী করবো তবে প্রতিটি ইটের সঙ্গে লিপ্ত থাকবে এক রতি করে সোনা। আমি দেবীর আদেশ রক্ষা করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলুম। তাতে করে দেবী আমার ওপর তুষ্ট হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্দ্ধান করলেন। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ভাবছিলুম দেবীর মন্দির তৈরী করার জন্যে আমি নতুনভাবে আদেশ দেবো দেবীর আদেশমত। তোমাকে সামনে দেখে ও তোমার কথা শুনে আমি তোমার কাছেই জানালুম আমার ও দেবীর ইচ্ছা। এখন থেকে দেবীর মন্দির তৈরী করার সময় প্রতিটি ইটের সঙ্গে থাকবে একরতি করে সোনা। যাও ভাই, তুমি এখুনি চলে যাও প্রধান রাজমিস্ত্রীর কাছে। তার কাছে গিয়ে জানাও আমার আদেশের কথা। আর সেই সঙ্গে চলে যাও তুমি কোষাগারের অধ্যক্ষের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে বলো, যে পর্য্যন্ত না দেবী কামাখ্যার মন্দির গড়া শেষ হচ্ছে সেই পর্য্যন্ত তিনি যেন রাজকোষ হতে রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন মত সোনা দিতে কার্পণ্য না করেন। এবার থেকে এই মত কাজ করলে আমার মনে হয় দেবীর মন্দির নির্মাণের কাজে আর কোন-রকম বাধা বিপত্তি আসবে না।

রাজা বিশ্বসিংহের কথা শুনে আনন্দিত হলেন শিল্পসিংহ। দেবীর অশেষ কৃপার কথা স্মরণ করে তাঁকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালেন। সেইসঙ্গে অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। এরপর তিনি রাজা বিশ্বসিংহের শ্রীচরণে প্রণিপাত জানিয়ে ফিরে এলেন প্রধান রাজ-মিস্ত্রীর কাছে। তার কাছে জানালেন বিশ্বসিংহের আদেশ।

প্রধান মিস্ত্রী রাজাদেশ শোনামাত্র সেইমত মন্দির তৈরী করতে লেগে গেল। রাজকোষের অধ্যক্ষ ঠিকমত সোনার পাত সরবরাহ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে দেবীর মন্দির সুন্দর ভাবে গড়ে উঠলো। রাজা বিশ্বসিংহের কাছে সংবাদটি পৌঁছলো। শুনে তিনি অশেষ খুসী হলেন। মনে মনে দেবী কামাখ্যার প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করলেন তাঁর সীমাহীন কৃপার কথা স্মরণ করে।

মন্দির নির্মাণ শেষ হলে বাসওরীয়া ব্রাহ্মণ এনে পূজোর আয়োজন করা হলো। রাজা বিশ্বসিংহের সময় দেবীর পূজোর কোনরকম অমর্য্যাদা ঘটে নি। তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করে দেহত্যাগ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মল্লদেব নরনারায়ণ। তিনি পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা বিশ্বসিংহের মোট আঠারোটি সন্তান। তাদের মধ্যে সকলের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হন নরনারায়ণ ও চিলারায়। চিলারায়ের আসল নাম শুক্লধ্বজ। ইনি রাজা নরনারায়ণের আমলে সেনাপতি ছিলেন।

রাজা নরনারায়ণের রাজত্ব কালে বিখ্যাত কালাপাহাড় কামাখ্যায় পদার্পণ করে দেবীর মন্দির ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। সেই সময়টা ছিল ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ। হঠাৎ রাজ্যময় এক সন্ত্রাসের ভাব দেখা দিল। সকলের চোখেমুখে ভীতির চিহ্ন প্রকাশ পেল। সকলে বিভিন্ন জায়গায় নানাপ্রকার গল্পগুজব করতে লাগলো, কালাপাহাড় আসছে কামরূপে। ও এলে এখানকার মন্দিরগুলি তো আস্ত থাকবে না। সেই কারণে সতর্ক হতে লাগলো অনেকে।

দস্যু কালাপাহাড়ের আসল নাম কালাচাঁদ রায়। পিতার নাম নয়নচাঁদ। পূর্ববঙ্গের রাজসাহী জেলার জাত্তন গ্রামে জন্মগ্রহণ করে কালাচাঁদ।

অল্পবয়সেই পিতাকে হারায় কালাচাঁদ। তাই ছোটবেলায় মানুষ হয় মাতামহের কাছে। সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সেইসঙ্গে ছিল দেহে অমিত বল এবং সৌন্দর্য্য। মাতামহের কাছে বাংলা, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা শেখে কালাচাঁদ। শ্রীপুর নিবাসী রাধামোহন

লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিয়ে করে কালাচাঁদ। বিয়ের দু'বছর পর কালাপাহাড় বাদশাহ সলিমান কেরানীর দয়ায় গৌড়নগরের ফৌজদার নিযুক্ত হন।

গৌড়ে আসার পর থেকে কালাচাঁদের জীবনে নেমে এলো অশান্তির ঘনঘটা। নবাবের এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম দুলারী বিবি। সে বাড়ীর ছাদ হতে কালাচাঁদকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তার অতুলনীয় রূপ ও দেহ সৌষ্ঠবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে।

ক্রমে বাদশার কানে গেল এই খবর। বাদশা তখন কালাচাঁদকে ডেকে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন।

রাজী হলো না কালাচাঁদ। তখন বাদশা তাকে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে বশীভূত করতে চাইলেন। কিন্তু তাতে করেও মন পেলেন না কালাচাঁদের। অবশেষে বাদশা ক্রোধভরে কালাচাঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তখনকার দিনে লোককে শূলে চড়িয়ে মারা হতো। তাই কালাচাঁদকেও শূলে চড়াবার আদেশ হলো।

ঘাতকেরা কালাচাঁদকে ধরে নিয়ে বধ্যভূমিতে এলো। এমন সময় দুলারী বিবি ঐ দৃশ্য দেখে দৌড়ে এলো কালাচাঁদের কাছে। তাকে আলিঙ্গন জানিয়ে ঘাতকদের বললে, আগে একে বধ না করে আমাকে বধ করো।

নবাবকন্যার ব্যবহার দেখে অবাক হলো ঘাতকেরা। তারা নবাবের কাছে এসে জানালে সমস্ত ব্যাপারটা। সব শুনে নবাব তখুনি চলে এলেন ঘটনাস্থলে।

ওদিকে কালাচাঁদ দুলারী বিবির অপূর্ব প্রেমের ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার প্রেম ও অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মন বদলে গেল। তখন সে দুলারী বিবিকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে রাজী হলো। ফলে সেই দিনই দুলারী বিবিকে বিয়ে করলে। সমাজের লোকেদের কাছে তার এইপ্রকার কাজ অসহ্য হয়ে উঠলো। তারা কালাচাঁদকে

করলে সমাজচ্যুত। কালাচাঁদ তখন মায়ের কথামত প্রায়শ্চিত্ত করলে।

কিন্তু হিন্দুসমাজ তাতে রাজী হলো না। তখন নিরুপায় হয়ে কালাচাঁদ এলো শ্রীক্ষেত্রে। সেখানে প্রভু জগন্নাথের মন্দিরে ধর্ণা দিলেন। সেখানেও কোন ফল হলো না। উল্টে পাণ্ডারা তার ওপর চালালো অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন।

ফলে ক্রোধে অন্ধ হয়ে কালাচাঁদ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। তার নতুন নাম হলো মহম্মদ ফার্মূলি। এরপর থেকে হিন্দুধর্ম ও তার দেবদেবীর প্রতি তার রাগ গেল বেড়ে। সে হিন্দুদের দেবদেবী ও মন্দির ধ্বংসের কাজে লেগে গেল। গৌড়দেশে ফিরে এসে সে শ্বশুরের সমস্ত সৈন্য সামন্ত দিয়ে তখনকার ওড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করে। এরপর কালাচাঁদ আক্রমণ করে প্রভু জগন্নাথের মন্দির। প্রভুর বিগ্রহ অগ্নিদগ্ধ করে এবং বহু পাণ্ডাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। এইসময় সে জনসাধারণের মাঝে কালাপাহাড় নামে পরিচিত হয়। এরপর কালাপাহাড় আসে আসামের কামরূপ জেলায়। দেবী কামাখ্যার মন্দির আক্রমণ করে অনেক জায়গা ধ্বংস করে। তাই দেখে সন্ত্রস্ত হন নরনারায়ণ। পিতার হাতে গড়া সুন্দর মন্দিরটি নষ্ট হচ্ছে দেখে তিনি কালাপাহাড়ের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং বারো বছর ধরে মন্দির সংস্কারে মন দেন।

দেবী কামাখ্যার কৃপায় রাজা নরনারায়ণ এবং তাঁর ভাই জীবনে নাম যশ এবং প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন আবার পরে দেবী তাঁদের কর্মদোষের জন্যে তাঁদের প্রতি দেন অভিশাপ।

রাজা নরনরায়ণের আমলে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে পূজারী ছিলেন এক ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম কেন্দুকলাই। তিনি ছিলেন মায়ের একান্ত ভক্ত এবং সিদ্ধ সাধক। বর্তমানে মন্দিরের অভ্যন্তরে শোভা

পাচ্ছে কেন্দুকলাইয়ের প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি। বহু লোক মায়ের কৃপা পাবার জন্যে আসতো কেন্দুকলাইয়ের কাছে। তিনি মায়ের কৃপায় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেন। একদিন এক সন্তানহারা জননী তার মৃত কন্যাটিকে নিয়ে এলো কেন্দুকলাইয়ের কাছে। এনে তাঁর চরণতলে শুইয়ে দিয়ে আকুলস্বরে কাঁদাতে লাগলো।

তার কান্না শুনে কেন্দুকলাই বললে, ও তো মরে গেছে। ওর জন্যে তুমি এমনভাবে চোখের জল ফেলছো কেন?

কেন্দুকলাইয়ের কথা শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারলে না মৃত সন্তানের জননী। সে বললে, না, আমার ছেলে তো মরে নি। সে তো ঘুমুচ্ছে। আপনার কৃপা হলে ও জেগে উঠবে।

কেন্দুকলাই বললে আমার কি শক্তি আছে বলো। মা কামাখ্যা যদি দয়া করেন তাহলে তোমার সন্তান বেঁচে যেতে পারে।

জননী বললে, আপনি মাকে একবার বলে দেখুন না। কেন্দুকলাই বললে, আমি তো তোমার জন্যে মাকে জানাবো। তার সঙ্গে তুমিও আকুলভরে ছেলের প্রাণভিক্ষা করো মায়ের কাছে।

এইরূপ বলে কেন্দুকলাই মৃত সন্তানটিকে কোলে করে নিয়ে এলো কামাখ্যা মায়ের যোনিমণ্ডলের কাছে। পবিত্র শিলাপীঠের ওপর মৃত সন্তানটিকে শুইয়ে রেখে কেন্দুকলাই মায়ের কাছে আকুল-ভাবে প্রার্থনা জানালেন, দে মা, ওকে বাঁচিয়ে দে। ওর প্রতি তুই কৃপা কর। তোর কৃপা না হলে যে আমার মুখরক্ষা হবে না।

ভক্তের কথা না শুনে কি পারেন জগজ্জননী। তিনি হাসিমুখে কৃপা করলেন। দেখতে দেখতে মৃত সন্তানের প্রাণ ফিরে এলো। মনে হলো কে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো।

তখন কেন্দুকলাই তাকে কোলে করে নিয়ে গেলেন তার জননীর কাছে। জননী তখন অধীর আগ্রহ নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল। তার দু'নয়ন ভেসে যাচ্ছিল বিগলিত অশ্রুধারায়।

জীবন্ত সন্তানটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে জননীর

কোলে বসিয়ে দিলেন ভক্ত কেন্দুকলাই। তখন পুত্রকে পুনরায় কোলের মাঝে ফিরে পেয়ে দু'নয়নে নির্মল হাসি ফুটে উঠলো জননীর। তিনি মাতৃকৃপা স্মরণ করে আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন। সেইসঙ্গে কেন্দুকলাইয়ের মাহাত্ম্যও চারদিকে রটে গেল। দলে দলে ভক্তজন এসে তাঁর কৃপালাভ করলো।

মায়ের নামগুণগান করে বেশ আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন কেন্দু-কলাই। অনেকের কাছে তাঁর ঐ প্রকার সুন্দর ও সুখময় জীবন সহ্য হলো না। একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে লাগলো। রাজা নরনারায়ণের কাছে নানা রকম নালিশ করলো। একজন এসে একদিন রাজাকে জানালে, আপনি কেন কেন্দুকলাইকে পূজারীর চাকরী হতে বরখাস্ত করছেন না। ও যে মন্দিরের মধ্যে নানারকম অনাচার অত্যাচার চালাচ্ছে।

রাজা নরনারায়ণ বললেন কেমন ধারা অত্যাচার ?

লোকটি বললে, সে আর আপনার কাছে কি বলবো হুজুর! সে কথা বলা যায় না।

রাজা বললেন, বলোই না আমার কাছে। আমি না শুনলে, না জানলে তার প্রতিকার করবো কিভাবে ?

লোকটি বললে, ঐ কেন্দুকলাই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আরতি করে। সেইসময় মন্দিরের মধ্যে মল পায়ে দিয়ে কে যেন নাচানাচি করে। অনেকে বলে কেন্দুঠাকুর নাকি সুন্দরী দেবদাসী নিয়ে গিয়ে রেখেছে মন্দিরের মধ্যে। তারাই মায়ের কাছে নাচ দেখায়। রাতে কেন্দুঠাকুর তাদের নিয়ে স্ফূর্তি করে।

সব শুনে রাজা নরনারায়ণ বললেন, একথা কি সত্যি ? তুমি স্বচক্ষে দেখেছ ?

—না হুজুর, আমি নিজে দেখিনি। মায়ের মন্দিরের আশে-পাশের মানুষজন নানারকম কানাঘুষা করে তাই আপনাকে জানাতে

এলুম।

—বেশ; কালই আমি অনুচর পাঠাবো মন্দিরে। তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি তখুনি কেন্দুকলাইকে বরখাস্ত করবো। সে আর মায়ের অর্চনা করতে পারবে না।

পরদিন রাজা নরনারায়ণ অনুচর পাঠালেন মায়ের কাছে। তারা সন্ধ্যেবেলায় মন্দিরের বাইরে ওৎ পেতে বসে রইলো। কিন্তু কোনরকম অনর্থ কাণ্ড দেখতে পেলে না। পরে হতাশ হয়ে ফিরে এসে রাজাকে সবকথা জানালে। রাজা শুনে নীরব রইলেন।

একদিন কেন্দুকলাই ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে বসে আছেন। নদীর ধারে অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করার জন্যে তাঁর মনে জেগে উঠলো অপূর্ব এক ভাব। বিভোর হয়ে গান গেয়ে চলেছেন আপন মনে। মা কামাখ্যাদেবীকে উদ্দেশ্য করে গাইছেন:

কতভাবে পাগলী তুই..........
তাতো আমি জানিনা
তোর ভাবে ভাবিয়ে তুলিস
কিছুই আমি বুঝি না.. ......

আবার কখনো গাইছেন:

তোর খেলা তুই না বোঝালে
বুঝবে কে বল্
খেলার ছলে করিস তুই
ত্রিভুবন চঞ্চল.........

গান গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে যান কেন্দুকলাই। তাঁর গানের অপূর্ব সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ছন্দময় ব্রহ্মপুত্র নেচে চলে।

অকস্মাৎ কয়েকজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন কেন্দুকলাই।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন চার-পাঁচ জন ষণ্ডামার্কা লোক

তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের চোখগুলো যেন অগ্নি-গোলকের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। জামার আস্তিন গোটানো কনুই পর্যন্ত। একজন বললে, কেন্দুকলাই মহা জোচ্চর। ও নিরীহ জনসাধারণকে মন্ত্রদ্বারা বশ করে তাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি কেড়ে নেয় দেবীর নামে।

আর একজন বললে, ঠিক বলেছিস্ তুই। যেমন করেই হোক ব্যাটাকে জব্দ করতে হবে।

আর একজন লোক বললে, ও ব্যাটা মাতাল। রাতে মদ খেয়ে দেবদাসীদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে। মন্দিরে যখন আরতি করে তখন মেয়েদের পায়ে মল বাজে। ওসব হচ্ছে কেন্দুঠাকুরের সঙ্গে দেবদাসীদের লীলা।

আর একজন বললে, ঠিক বলেছিস ভাই। আজই বেটাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।

শেষজন বললে, বদমায়েস কেন্দুকে ঐ গাছটার সঙ্গে বেঁধে আচ্ছা করে চাবুক মারবো। তাই তো আমি চাবুকটাকে সঙ্গে করে এনেছি।

ঐ বলে তারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো কেন্দুকলাইয়ের কাছে। তাঁর কাছে এসে জানালে, যাক বেশ হয়েছে। তোমাকে আর ভণ্ডামী করতে হবে না। এখন মায়ের গান থামিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে।

ওদের দিকে বিস্ময়বিমূঢ় ভাব নিয়ে একবার তাকালেন কেন্দু-কলাই। তারপর বললেন, আমি কি করেছি? আমাকে কেন তোমরা এসব কথা বলছো? আমি তো কেবল মায়ের গান গাইছি।

আগন্তুকদের মধ্যে থেকে দু'জন মুখচোখ বিকৃত করে বলে উঠলো, ওসব ন্যাকামি করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে চলো।

কেন্দুকলাই বললে, কোথায় যাবো?

অমনি একজন বললে, জামাইবাড়ী গো জামাইবাড়ী।

কেন্দুকলাই বললেন, না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। আমি এখানে বসে মায়ের নাম করবো। তোমরা বরং আসতে পারো।

কেন্দুকলাইয়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পাঁচজন দুর্বৃত্ত তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললে। তারপর গায়ের জোর প্রয়োগ করে তাঁকে একপ্রকার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো নিকটবর্তী একটি গাছের তলায়। ঐ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললে কেন্দুকলাইকে। তারপর আরম্ভ করলে চাবুক মারতে।

কেন্দুকলাই কিন্তু নির্বিকার রইলেন। কোনরকম প্রতিবাদ জানালেন না। একমনে দেবী কামাখ্যার নাম করতে লাগলেন।

হঠাৎ ঘটে গেল এক অঘটন। যে গাছের সঙ্গে ওরা ভক্ত কেন্দুকলাইকে বেঁধে রেখে প্রহার করছিল সেই গাছের একটা শাখা ভেঙ্গে পড়লো চাবুকধারী মানুষটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হলো। তাই দেখে অন্যান্য দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেল।

অতঃপর কেন্দুকলাইয়ের দেহ থেকে রজ্জুবন্ধন শিথিল হয়ে পড়লো দেবী কামাখ্যার কৃপায়। তিনি নির্বিঘ্ন হয়ে পুনরায় চলে এলেন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। সেখানে বসে আপন মনে মায়ের গান করতে লাগলেন।

একদিন রাজা নরনারায়ণ কেন্দুকলাইয়ের কাছে এসে জানালেন, শুনেছি দেবী কামাখ্যাকে নারীরূপে চর্মচক্ষে দেখা যায়, একি সত্যি কথা?

কেন্দুকলাই বললেন, হ্যাঁ, সত্যিকথা। আপনিও ইচ্ছা করলে দেবীর দর্শন পেতে পারেন।

ভক্ত পুরোহিতের কথা শুনে রাজা নরনারায়ণ বললেন, কিভাবে দেবী কামাখ্যার দর্শন পাবো তা বলে দিন। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখবো।

কেন্দুকলাই বললেন, বেশ, আপনি একটা কাজ করুন। রাজ্যে ঘোষণা করে দিন যে যত কুমারী কন্যা আছে তারা যেন অমুকদিন রাজবাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। রাজা নরনারায়ণ তাদের বিশেষ দক্ষিণা দেবেন।

এরূপ ঘোষণা করলে অনেক কুমারী আসবে রাজবাড়ীতে। তখন আপনি প্রতিটি কুমারীর হাতে একটি করে রূপোর টাকা দেবেন। সেইসঙ্গে পরাবেন ললাটে সিন্দুরবিন্দু।

কেন্দুকলাইয়ের কথা মত রাজা তাই করলেন। যেসব কুমারীকন্যা এলো তাঁর সামনে তিনি নিজের হাতে তাদের ললাটে এঁকে দিলেন সিন্দুরবিন্দু। সেইসঙ্গে হাতে দিলেন রূপোর টাকা। কিন্তু তার মধ্যে রাজা এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। সেটি হচ্ছে এই যে অতগুলো কুমারী কন্যাদের মধ্যে একজন কিন্তু সিন্দুরবিন্দু ললাটে ধারণ করলে না।

পরে রাজা কেন্দুকলাইয়ের কাছে এসে বললেন, আপনি যে বলেছিলেন, মা কামাখ্যাকে কুমারীর রূপে দেখা যাবে অমুক অমুক আয়োজন করলে কিন্তু কোথায় আমি তো তা দেখতে পেলুম না।

কেন্দুকলাই বললেন, সেকি কথা! আপনি কি মা কামাখ্যাকে কুমারীরূপে দেখতে পান নি?

—না তো।

—আচ্ছা আপনি কি সব কুমারীর কপালে সিন্দুরবিন্দু পরাতে পেরেছেন?

কেন্দুকলাইয়ের কথা শুনে রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, না, সব মেয়ের ললাটে তো সিন্দুরবিন্দু দিতে পারি নি। একটি কুমারী বাদ পড়েছে। তার ললাটে সিন্দুর-বিন্দু পরাতে গিয়ে বাধা পেলুম। সে আমার কাছে এসে সহাস্যমুখে দাঁড়াতেই আমি আঙ্গুলে করে সিন্দুরবিন্দু নিয়ে তার

ললাটে পরাতে যাচ্ছি এমনসময় সে একটু সরে গিয়ে বললে, 'এই, চোখে লাগবে।' আমি তখন আর পরালুম না। হাত নামিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। অতঃপর মেয়েটি আমার সামনে থেকে সরে গেল।

রাজার কথা শুনে একটু হাসলেন কেন্দুকলাই। তারপর ধীর-গলায় বললেন, ঐ কুমারীই হচ্ছেন মা কামাখ্যা! ওঁর ললাটে যে ত্রিনয়ন শোভা পাচ্ছে। তাই আপনি যখন ওঁকে সিন্দুর-বিন্দু পরাতে যান তখন উনি তা গ্রহণ করতে চাননি।

কেন্দুকলাইয়ের কথা এবার বিশ্বাস হলো রাজা নরনারায়ণের। ভাবাবেগে পুরোহিতের শ্রীচরণে মাথা রেখে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। সেইসঙ্গে বললেন, আপনি একজন মহাপুরুষ। আপনি সিদ্ধ সাধক। আপনাব কৃপায় আমি দেখতে পেলুম চিন্ময়ী দেবীকে এই চর্মচক্ষু দিয়ে। আঃ আজ আমাব কি সুন্দর ভাগ্য। আমার জীবন হলো সার্থক।

এরপর থেকে কেন্দুকলাইয়েব প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সকলে তাঁর ঐশ্বরীক শক্তিব ওপব বিশ্বাস রেখে তার কাছে আসতে লাগলো। ক্রমে কামরূপ কামাখ্যা এক মহাতীর্থে পরিণত হলো।

ইদানীং কেন্দুকলাই যখন মায়ের জন্যে সান্ধ্য-আরতি করেন তখন দেবী কামাখ্যা ভক্তের প্রতি তুষ্ট হয়ে আরতির ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে নৃত্য সুরু করেন। দেবীর পায়ে শোভা পায় মল। তার শব্দ শোনা যায়। অনেক ভক্ত নাকি শুনেছে। তাদের মধ্যে একজন এসে বাজা নরনারায়ণকে জানালেন ঘটনাটি।

রাজা তখন ডেকে পাঠালেন কেন্দুকলাইকে। কেন্দুকলাই গেলেন রাজার কাছে। তাঁকে কাছে পেয়ে রাজা বললেন, শুনতে পেলুম আপনি যখন মন্দিরে সন্ধ্যারতি করেন তখন দেবী

আপনাকে দর্শন দেন। কেবল দর্শন দেন না, তার সঙ্গে তিনি নৃত্যও করেন। আমি আপনার মত দেবীর চিন্ময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছুক।

রাজার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কেন্দুকলাই। তারপর বললেন, আপনি দেবীর ঐ রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারবেন তবে মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে তা পারবেন না। মন্দিরের বাইরে থেকে ঐ রূপ দেখতে পাবেন। নাটমন্দিরে যে রন্ধ্র আছে সেই 'কুন্দ্রাক্ষের জলারে' দেখা যায় মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ। সন্ধ্যে-বেলায় আরতীর ঘণ্টা শুনে আপনি আসবেন ঐ রন্ধ্রের কাছে। ওখান থেকে দেখবেন দেবীকে।

পুরোহিতের কথা শুনে আনন্দিত হলেন রাজা নরনারায়ণ। তিনি পুরোহিতকে সন্তুষ্ট মনে বিদায় দিয়ে সন্ধ্যের জন্যে কাল গুনতে লাগলেন।

অবশেষে এলো সেই শুভলগ্ন। দেবীর আরতি আরম্ভ হলো। কাঁসর ও ঘণ্টাধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে শোনা গেল দেবী কামাখ্যার পায়ের মলধ্বনি।

কৌতূহলী হয়ে রাজা নরনারায়ণ এসে দাঁড়ালেন কেন্দুকলাইয়ের নির্দেশমত সেই রন্ধ্র পথে। আড়ি পেতে উঁকিমেরে দেখতে লাগলেন লীলাময়ী কামাখ্যা দেবীর অপরূপ চিন্ময়ী মূর্তি।

রাজা তন্ময় হয়ে দেখছেন সেই মূর্তি, এমন সময় ঘটে গেল এক অঘটন। দেবী কামাখ্যা বুঝতে পারলেন যে কেন্দুকলাইয়ের কথামত রাজা নরনারায়ণ দেখছেন মায়ের চিন্ময়ী রূপ। এতদিন মায়ের এই লীলাব কথা একমাত্র কেন্দুকলাই ছাড়া আর কেউ জানতেন না। এবার সেই অতি গুহ্য অধ্যাত্ম-সংবাদ চতুর্দিকে জানাজানি হয়ে গেল। দেবী রুষ্ট হয়ে কেন্দুকলাইয়ের শিরশ্ছেদ করলেন। সেইসঙ্গে রাজা নরনারায়ণকে অভিশাপ দিলেন, আজ থেকে তুই কিংবা তোর বংশের কেউ আমার মন্দিরে আসতে

পারবি না, এমনকি আমার মন্দির দেখতেও পাবি না। দেখলে তোদের বংশে অমঙ্গল ঘটবে।

দেবীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলেন রাজা নরনারায়ণ। কেবল তিনি কেন চিলারায় প্রমুখ রাজার আত্মীয়-স্বজন কঠোরভাবে দেবীর আদেশ পালন করে চললেন। তাঁরা কখনো কোন কাজে দেবীর মন্দিরের কাছাকাছি এলে অমনি চোখ বেঁধে আসতেন। পরবর্তীকালে রাজা নরনারায়ণের বংশধরগণ ঐরূপ আচরণ করতেন।

আজও কামরূপ কামাখ্যায় কেন্দুকলাইয়ের শিরশ্ছেদনকে কেন্দ্র করে একটি প্রবাদ জনসাধারণের মধ্যে চালু আছে। কাউকে ভয় দেখাবার সময় ওখানকার লোকেরা বলে আসে, 'কেন্দুকলাইর মুরছিঙ্গার দরে মুরছিঙ্গিম'। অর্থাৎ কেন্দুকলাইয়ের মাথা যেমন ছিন্ন হয়েছিল তেমনি তোমার মাথাও ছিন্ন হবে।

যাহোক দেবী কামাখ্যার মাহাত্ম্য এই অভিশাপ প্রদানের পর থেকে কমে যায় নি বরং দিনের পর দিন বৃদ্ধির মুখে।

কামাখ্যার মুল মন্দিরের গম্বুজটি মাটি থেকেই উঠেছে। গম্বুজের গায়ে সমান্তরাল বেড়াগুলি দেখতে বড় মনোরম। মুসলমানী ঢংয়ে তৈরী হয়েছে গম্বুজটি। শীর্ষদেশ সূক্ষ্ম হতে ক্রমশ সূক্ষ্মতর হয়ে গেছে। কামাখ্যা মন্দিরের সংলগ্ন আরও কয়েকটি মন্দির আছে। ওদের ছাদগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে দেখলে মনে হয় না যে ওগুলি মন্দির। কামাখ্যার মন্দিরের সামনে রয়েছে নাটমন্দির। মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতে হলে ক্রমে ৬।৭ ফিট নীচে মাটির ভেতরে যেতে হয়। একটা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই মন্দিরের।

মন্দিরের ভেতরে সবসময় অন্ধকার বিরাজ করছে। দিনে কিংবা রাতে প্রদীপ ছাড়া মন্দিরের ভেতর কিছু দেখা যায় না। মন্দিরের ছাদটি দ্বাদশ প্রস্তর স্তম্ভের ওপর বিদ্যমান রয়েছে।

মন্দিরের ভেতর সামনেই দেবীর প্রতিমূর্তি অষ্টধাতু নির্মিত দশভুজা, উচ্চ বেদীতে অবস্থান করছেন। তার সামনে প্রতিদিন অনেকরকম বলি দেওয়া হচ্ছে। দেওয়ালে খোদাই করা রয়েছে নানারকম মূর্তি। তার সঙ্গে রয়েছে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের প্রতিমূর্তি। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্তিও রয়েছে। চেদিরাজের প্রতিমূর্তিও শোভা পাচ্ছে এক জায়গায়।

মন্দিরের নিম্নভাগে চতুষ্কোণাকৃতি প্রস্তরের মধ্যে দেবীর প্রধান পীঠ যোনিমুদ্রা। ঐটি লম্বায় ছ'ফিট ও চওড়ায় এক ফুট হবে। কোন মূর্তি নেই, হাত মাত্র প্রবেশ করানো যেতে পারে এমন একটি গর্ত রয়েছে। সেখান থেকে প্রস্রবণ আকারে জল দিবারাত্র নির্গত হচ্ছে। যাত্রীরা এখানে পুজো দিয়ে জপ করে। এই স্রোতধারা নাকি পাতাল হতে উঠেছে। এখানে এলে পাণ্ডারা যাত্রীদের নিয়ে তিন প্রকার শ্লোক উচ্চারণ করেন।

প্রথমে দেবীকে প্রণাম করার জন্যে বলতে হয়—

কামাখ্যে বরদে দেবী নীল পর্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোহস্তুতে ॥

দ্বিতীয়বার দেবীকে স্পর্শ করার সময় বলতে হয়—

মনোভব গুহামধ্যে রক্তপাষাণ রূপিনী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

দেবীর চরণামৃত পান করার সময় বলতে হয়—

শুকাদীনাঞ্চ যজ্ঞ্যানং যমাদি পরিশোধিতম্।
তদেব দ্রবরূপেণ কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে ॥

দেবীকে স্পর্শ করে মুদ্রার জল পান করলে দেবঋণ, পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং এক কোটি গো-দানের মত পুণ্য ফল লাভ হয়।

প্রস্তরখানির এক পাশ রূপোর পাত দিয়ে বাঁধান। যাত্রীরা

এখানে নৈবেদ্য, শাড়ী প্রভৃতি এনে ভক্তিপূর্বক জবা ফুল ও পুষ্পমালা উৎসর্গ করে। গর্ভের ওপর স্বুবর্ণ নির্মিত্ত বহুমূল্যের মুকুট শোভা পাচ্ছে। প্রতি বছর অম্বুবাচীর সময় এখানে মহা ধূমধাম সহযোগে উৎসব সম্পন্ন হয়। সে সময় নাকি দেবী হন রজঃস্বলা। তার প্রমাণস্বরূপ দেবীকে সাদা কাপড় পরিয়ে দিলে লালরঙের হয়ে যায়। এই তিনদিন বেদ অধ্যয়ন বা বীজবপন নিষিদ্ধ। অম্বুবাচীর সময় যদি কোন সতী, বিধবা, ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ সপাক বা পরপাক আহার করেন তাহলে চণ্ডালের পাককরা অন্ন আহার করলে যে পাপ স্পর্শ করে তাঁকে সেই পাপে জড়িত হতে হয়।

পাণ্ডাদের কাছ থেকে মহামায়ার এক টুকরো রক্তবর্ণ কাপড় সংগ্রহ করতে হয়। লোকে বলে ঐ কাপড়ের এক টুকরো যদি কোন গেরস্থের বাড়ীতে থাকে তাহলে তাব আব কোন অমঙ্গল হয় না। এখানে সধবা পূজার ব্যবস্থা আছে। পাণ্ডাদের হাতে কিছু পয়সা দিলে তার যথাযথ ব্যবস্থা হয়ে যায়।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির ছাড়া দশ মহাবিদ্যার আবও দশটি মন্দির আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। এটিকে স্থানীয় লোকেরা বলে বলন্তা মন্দির। এটি কামাখ্যা মন্দির হতে আধ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। একবার এটি ভুমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরে দ্বারভাঙার মহারাজা নতুন করে নির্মাণ করে দেন। এখানে একটি ধর্মশালা আছে। বলন্তা মন্দিরের গায়ে অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। নীলকণ্ঠ মহাদেব, নন্দীভৃঙ্গী, অন্নপূর্ণা, বটুক, ভৈরব, নারায়ণ, গোপাল, মঙ্গলচণ্ডী আর কল্কি অবতার। তার সঙ্গে শোভা পাচ্ছে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, দ্রোণাচার্য্য, মনসা, জগৎকারু আর কপিলমুনি।

কামাখ্যা দেবীর ভৈরব হচ্ছেন উমানন্দ। কেউ কেউ এঁকে বলে কামেশ্বর। সহরের পূবদিকে একটি ছোট দ্বীপে উমানন্দের মন্দির। দ্বীপটি এক খণ্ড বড় পর্বতচূড়া বিশেষ। সমস্তই প্রস্তরময়।

পূর্বদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের একটি স্রোতে মূল পাহাড় হতে যেন একে বিচ্ছিন্ন করেছে। চারদিকে জলের বেগ বর্তমান। নৌকো ভাড়া করে সেই দ্বীপে যাওয়া যায়। যাত্রীরা নৌকো করে গিয়ে মহাদেবকে দেখে আসে। এই ভৈরবের পূজো না করলে কামাখ্যা দেখা সার্থক হয় না। এটি পেতলের তৈরী পঞ্চমুণ্ডযুক্ত শিববিশেষ। দেখতে বড় সুন্দর। দেখলেই মনে ভক্তির উদয় হয়। মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত এবং চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত।

কামাখ্যাতীর্থের সবচেয়ের বড় উৎসব হচ্ছে পৌষ মাসে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে কামাখ্যা দেবীর সঙ্গে কামেশ্বরের বিবাহপর্ব। এছাড়া শরৎ ও বসন্তকালে দেবী দুর্গার আরাধনার বিশেষ নিয়ম রয়েছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার লিখেছে—

'Sati's organs of generation are said to have fallen on the place now covered by the temple and this fact renders the spot an object of pilgrimage to devout Hindus from every part of India. Other temples stand on the hill and from the summit a magnificent view is obtained over the river and the surrounding country. A grant of revenue free land nearly 8,000 acres in entent made to the temple by the native ruler of Assam, has been confirmed by the British Government. The most important festivals are the Pous Bia, about Christmas time, when Kamakhya is married to Kameswar and the Basanti and Durga Pujas which are celebrated, the former in the spring, the latter in the autumn. (*Imperial Gazetter of India-Estern Bengal & Assam-1909-P. 546*)

গৌহাটিকে আগেকার দিনে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলা হতো।

আর কামরূপ হচ্ছে বর্তমান আসাম প্রদেশের একটি জেলা। গৌহাটির পূর্বদিকে চিত্রশালা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত নবগ্রহ মন্দির। প্রাচীনকালে এখানে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। এছাড়া গৌহাটিতে রয়েছে অনেকগুলি মন্দির। যেমন জনার্দ্দন, হাজো ইত্যাদি।

গৌহাটি থেকে ২২ কিলোমিটার বা ১৪ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর দিকে রয়েছে হাজো মন্দির। কারণ এটি অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত। এদের মধ্যে নামকরা হচ্ছে হয়-গ্রীবা মাধব মন্দির। ভগবান শ্রীহয়গ্রীব মাধবের অশ্বের মত গ্রীবা থাকার জন্যে এই দেবতার নাম হয়েছে শ্রীহয়গ্রীবমাধব। একশ্রেণীর বৌদ্ধদের ধারণা যে গৌতমবুদ্ধ এখানেই মহানির্বাণ লাভ করেন। অনেক বৌদ্ধ শীতকালে এখানে ভ্রমণ করতে আসেন। মুসলমানেরাও বাদ যায় না। এখানে মুসলমানদের জন্যে রয়েছে একটি মসজিদ। মসজিদটি তৈরী করেন পীর গিয়াসুদ্দিন আউলিয়া।

হাজো মন্দির প্রসঙ্গে *Imperial Gazetter of India* লিখছে :···Hajo is famous for a temple of Siva which stands in a picturesque sitution on the top of a low hill. It is said to have been originally built by one Ubo Rishi and to have been restored by Raghu Dev (A. D. 1583) after it had been damaged by the Muhammadan general Kala Pahar. It is an object of Veneration not only to Hindus but also to Buddhists, who visit it in considerable numbers under the idea that it was at one time the residence of Buddha. The building has some claims to architectural beauty, but was damaged by the earthquake of 1897······'(*Imperial Gazetter of India Eastern Bengal & Assam—P 546—year—1909*)

এখানকার বরাহকুণ্ডের জল অতি পবিত্র। ভগবান বরাহ

অবতার হয়ে নিজে এসে এখানে এই কুণ্ডটি খনন করান। এখানে এক পর্বত গুহার কাছে রয়েছে গোকর্ণ যোগীর প্রস্তর মূর্তি। দ্বাপরে গোকর্ণ যোগী পর্বত গুহায় বসে তপস্যা করতেন। একদিন রাবণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বিশাল মূর্তি দেখে ভীত হয়ে গোকর্ণ প্রবেশ করেন গুহায়। রাবণ তখন পাথর দিয়ে ঢেকে দেন গুহার মুখ। পরে স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় উদ্ধার পান যোগীরাজ। তারা পরে যোগীবরের একটি প্রস্তর মূর্তি তৈরী করে দেয় তাঁর মহাসমাধির পরে।

কামরূপের দক্ষিণে পাহাড়ের ওপর দেখা যায় পাথরের একটি ঘর। লোকে বলে, এটি নাকি চাঁদ সদাগরের তৈরী লখীন্দরের বাসর ঘর। ঘরটি এক দরজাযুক্ত। বেহুলার কৌশলে ও নেতা-ধোপানীর অনুগ্রহে মৃত লখীন্দর আবার পুনর্জীবন লাভ করে। ধুবড়ী সহরে নেতা ধোপানীর ঘাট আর কাপড় কাচার একখানা বড় পাথর এখনো দেখা যায়।

কামরূপের আর একটি স্মরণীয় বস্তু হলো বশিষ্ঠাশ্রম। পুরাকালে বিদেহী হয়ে ঋষি বশিষ্ঠ এখানে তপস্যা করেন। সূর্যবংশের রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র ছিলেন নিমি। তিনি হিমালয়ের কাছে বৈজয়ন্ত নগরে রাজত্ব করতেন। একবার তিনি এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি প্রথমে ঋষি বশিষ্ঠ এবং পরে গৌতমকে যাজকত্বে বরণ করেন। বশিষ্ঠ তখন দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞকর্মে রত ছিলেন। তাই তিনি রাজা নিমির যজ্ঞসভায় ঠিকমত আসতে পারেন নি। তাই রাজর্ষি নিমি গৌতমকেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করার জন্যে আহ্বান জানান। গৌতম এসে নিমির যজ্ঞ যথারীতি সুরু করে দিলো। ওদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করে ঋষি বশিষ্ঠ এলেন রাজর্ষি নিমির যজ্ঞসভায়। এসে দেখলেন রাজা গৌতমকে দিয়ে যজ্ঞক্রিয়া সমাপ্ত করেছেন। ঋষি বশিষ্ঠ যখন রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন তখন রাজা নিমি শয্যায় শয়ন করে নিদ্রা

যাচ্ছিলেন। ঋষি ঐ নিদ্রিত অবস্থায় রাজর্ষি নিমিকে অভিশাপ দিলেন, তোমার মৃত্যু হবে।

পরে নিদ্রা ভঙ্গ হলে রাজা যখন পারিষদ মুখে শুনলেন যে ঋষি বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন তখন তিনিও ঋষিকে অভিশাপ দিলেন, তোমারও মৃত্যু হবে।

পরে উভয়েই নির্দেহ হলেন। রাজা নিমি সকলের নেত্রে অবস্থান করতে লাগলেন। আর বশিষ্ঠ আশ্রমে এসে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন।

পুরাণে কিন্তু অন্যপ্রকার কাহিনী আছে। নিমির শাপে ঋষি বশিষ্ঠের তেজ প্রবেশ করলো মিত্রাবরুণের তেজে। তারপর সেই তেজ থেকেই পুনর্জন্ম হলো বশিষ্ঠের উর্বশীর সান্নিধ্যে।

ঋষি বশিষ্ঠ দেহহীন হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। পরে ব্রহ্মার পরামর্শমত তিনি এলেন এই নির্জন সন্ধাচলে। বসলেন ঘোরতর তপস্যায়। তাঁর ঘোরতর তপস্যার গুণে সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা নামে ত্রিধারায় প্রবাহিত হলো গঙ্গা। ঋষি বশিষ্ঠ সেই গঙ্গার জলে অবগাহন করে বিষ্ণুর বরে পুনরায় তাঁর পূর্বদেহ ফিরে পেলেন।

চতুর্দিকে পাহাড়-ঘেরা একটি নির্জন জায়গায় অবস্থিত বশিষ্ঠাশ্রম। উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যে জলপ্রপাতটি বেগে নেমে আসছে তারই নাম বশিষ্ঠ গঙ্গা। প্রতিদিন ঋষি বশিষ্ঠ ঐ ত্রিধারা সঙ্গমে ত্রিসন্ধ্যা করতেন। এখানে একদিন যদি কেউ ত্রিসন্ধ্যা করে তাহলে তার পতিত সন্ধ্যার পাপ যায় ক্ষয়ে। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে ঋষি বশিষ্ঠের পদচিহ্ন।

ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম হতে কিছুদূরে দেখতে পাওয়া যাবে একটি শিলাচিহ্ন। লোকে বলে ঐ শিলাটি নাকি ঋষিপত্নী অরুন্ধতীর। কিন্তু অতিকায় জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত বলে লোকে ওর কাছে যেতে চায় না।

ঋষি বশিষ্ঠ সম্বন্ধে এখানে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এটি কালিকাপুরাণেও আছে। এটি একটি কাহিনীও বলা যেতে-পারে। প্রাচীনকালে কামরূপের এমন মাহাত্ম্য ছিল যে এখানকার জলে স্নান করেই লোক স্বর্গে যেতো।

যম পার্বতীকে অত্যন্ত ভয় করতো। সেই ভয়ে সে কাউকে স্পর্শ করতে পারতো না। ফলে তার কাজকর্ম সব পণ্ড হবার উপক্রম হলো। তখন যম চলে এলো ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা তাকে নিয়ে এলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললেন, আমি কিছু করতে পারবো না যম। তুমি পার্বতীর পতি শিবের কাছে যাও।

বিষ্ণুর কথামত যম এলো শিবের কাছে। তাঁর কাছে জানালে সমস্ত বৃত্তান্ত। ব্রহ্মা বললেন, মানুষের ওপর যদি যমের অধিকার না থাকে তাহলে পৃথিবীতে সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা যাবে পণ্ড হয়ে। আপনি এর একটা বিহিত করুন।

ব্রহ্মার এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। পরে তিনি এলেন কামরূপ কামাখ্যায়। এখানে অবস্থান করছিলেন উগ্রতারা এবং তাঁর অনুচরগণ। শিব তাদের আহ্বান জানিয়ে বললেন, এখানকার সব মানুষদের তাড়িয়ে দাও।

শিবের অনুমতিমত কাজ করল তাঁর অনুচরগণ। তারা সকলকে একে একে তাড়িয়ে দিলে। শেষকালে এলো ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে। তাঁকেও তাড়াবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করলে।

ঋষি তাদের ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, একী রকম কথা! আমি বেদজ্ঞ তপস্বী। আমার প্রতিও তোমরা এমন দুর্ব্যবহার করছো।

এইরূপ বলে ঋষি বশিষ্ঠ অভিশাপ দিলেন উগ্রতারাকে, তুমি বামা, বেদবিরুদ্ধভাবে তোমার অর্চনা হবে। তোমার প্রমথরা এখানে বাস করবে ম্লেচ্ছরূপে। শিব আমাকে তাড়াতে বলেছেন। আমি সেই কারণে তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছি, তিনিও ম্লেচ্ছের মত অস্থি ও ভস্ম

ধারণ করে এই কামরূপে বাস করবেন। যে তন্ত্রে কামরূপের মাহাত্ম্য আছে তাও এখানে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

অভিশাপ দেবার পর চলে গেলেন ঋষি বশিষ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে কামরূপ বেদমন্ত্রহীন ম্লেচ্ছ জাতিতে পরিণত হলো। ঠিক ঐ সময় উৎপত্তি হলো ব্রহ্মপুত্র নদের। কামরূপের নদীকুণ্ড ও তীর্থগুলি গোপন করার জন্যে ব্রহ্মা এক জলপুত্রের জন্ম দেন। এই পুত্রের জননীর নাম অমোঘা। তিনি শান্তনুর স্ত্রী। পরে পরশুরাম এই ব্রহ্মপুত্রকে নিজের কুঠার দিয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত করলেন। সদিয়ার উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে একটি জায়গা আছে। তা আজও ঋষি-কুঠার নামে বিখ্যাত। তখন থেকে কামরূপের সমস্ত তীর্থ গেল লুপ্ত হয়ে। যারা এইরূপ ভেবে (অর্থাৎ সমস্ত তীর্থ লুক্কায়িত আছে ব্রহ্মপুত্র নদের জলের ভেতর) ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র জলে অবগাহন করে তাদের সমস্ত তীর্থস্নানের ফল লাভ হয়। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অসামান্য। যোগিনীতন্ত্রের একটি সুন্দর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কামরূপের মাহাত্ম্য :

'দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যং ন তৎসমম্।'
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে ॥'

অর্থাৎ দেবীক্ষেত্র কামরূপের মতো স্থান আর নেই। অন্যত্র দেবী বিরলদর্শন, কিন্তু কামরূপের ঘরে ঘরে তিনি বিরাজ করছেন।

কিবা সাধক কিবা গৃহী সকলেই কামাখ্যায় এসে কুমারী পূজা করেন। মা এখানে কুমারীরূপে বিরাজিতা। সাধক বা ভক্তের কাছে দেবী কামাখ্যা মাতা বা কুমারীরূপে প্রসিদ্ধা। সাধক এখানে এসে দেবীকে কুমারীজ্ঞানে পূজো করে আনন্দ লাভ করে। সে আনন্দে আস্বাদ মেলে ভক্তির অমৃত, সেখানে কামনার হলাহল নিঃশেষিত। সাধারণ বিষয়ী মানুষ কামাখ্যার সিদ্ধপীঠে এসে মনের কত রকম কামনা বাসনা নিবেদন করে। মা কামাখ্যা কামেশ্বরী। তিনিই কামদাত্রী। সাধারণ সংসারজীবের মনের

কোণে সকল রকম কামনা বাসনা পূরণ করে থাকেন। আর কেনই বা তা করবেন না। তিনি যে জননী। আমরা তাঁর সন্তান। মা বেশ ভালভাবে বোঝেন কোথায় সন্তানের দুঃখকষ্ট। তিনি সেইমত সন্তানকে দেখেন। আবার সন্তান যদি কোনরকম অন্যায় করে তাহলে মা তার প্রতি সদা খড়্গাহস্ত। এ তাঁর কর্তব্য এবং নিত্য কর্ম। তাই সাধক বা ভক্তজন দেবীকে মাতৃজ্ঞানে বা কুমারীজ্ঞানে অর্চনা করে যেরূপ আনন্দ লাভ করে তেমন আনন্দ অন্য কোন প্রকার অর্চনা পদ্ধতিতে লাভ করতে পারে না। যোগিনীতন্ত্রে আছে :

সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা হি কুমারী নাত্র সংশয়:
একা হি পূজিতা বালা সর্ব্বং হি পূজিতং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ কুমারী মা হচ্ছেন সর্ববিদ্যাস্বরূপা। একটি কুমারী পুজো করলেই সমস্ত দেবদেবীদের পূজো করা হয়।

সাধক মায়ের কুমারীরূপ ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করে কিংবা কুমারী মনুষ্যকন্যাকে দেবীজ্ঞানে সামনে পূজোর আসনে বসিয়ে পূজো করে। প্রথমেই শাস্ত্রীয় মন্ত্র পাঠ করে পূজো আরম্ভ করে :

'ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরী বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্।
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং চিন্তয়েৎ শুভাম্॥'

আবার বলে :

'ওঁ মন্ত্রাক্ষরময়ীং দেবীং মাতৃণাং রূপধারিণীম্।
নবদুর্গাত্মিকাং সাক্ষাৎ কন্যামাবহয়াম্যহম্॥'

পূজো সমাপ্ত হলে সাধক এই মন্ত্র পাঠ করে মায়ের চরণে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন :

'ওঁ জগদবন্দ্যে জগৎপূজ্যে .সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।
পূজাং গৃহাণ কৌমারি জগন্মাতর্নমোহস্তুতে॥'

কামরূপ কামাখ্যার আশে পাশে আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য তীর্থ আছে। একটির নাম পাণ্ডুনাথের মন্দির অন্যটির নাম সৌভাগ্যকুণ্ড।

পাণ্ডুনাথের মন্দিরটি পাণ্ডু ষ্টেশনের খুব কাছে অবস্থিত। কিংবদন্তী বলে, বিষ্ণু নাকি এখানে মধু ও কৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে বধ করেন। যে শিলার ওপর দাঁড়িয়ে বিষ্ণু ঐ অসুরদ্বয়কে বধ করেন তা এখন মন্দিরের কাছে বিষ্ণুশিলা নামে খ্যাত। মন্দিরটি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বরাহ পর্বতের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত। বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডবরা এখানে বেশ কিছুকাল কাটান। এই কারণে এই স্থানটি পাণ্ডুনগর নামে খ্যাত। সংক্ষেপে বলা হয় পাণ্ডু। এখানে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি রয়েছে। ওঁরা যখন এখানে ছিলেন তখন প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্র নদে অবগাহন করে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে গিয়ে পুজো করতেন। সেইসঙ্গে নিজেদের অন্তরকামনা নিবেদন করতেন দেবী কামাখ্যার কাছে যাতে তাঁরা তাড়াতাড়ি হারানো রাজ্য ফিরে পান।

আর সৌভাগ্যকুণ্ডটি কামাখ্যা মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত। একটি পুষ্করিণী বিশেষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ নাকি এই জলাশয়টি নির্মাণ করেন। এখানে স্নান ও তর্পণের নিয়ম আছে। এই কুণ্ড প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়।

কুণ্ডের তীরে রয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি। মন্দিরের ভেতর দ্বাদশ স্তম্ভের মাঝখানে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মত হরগৌরীর ভোগমূর্তি শোভা পাচ্ছে। কামরূপে ঐ মূর্তিকে বলে বলন্তা মূর্তি। তার অর্থ হচ্ছে উৎসবের জন্যে তৈরী দেবতার একটি বলবান মূর্তি। পাথরের সিংহাসনে শোভা পাচ্ছে অষ্টধাতুর হরগৌরী মূর্তি। বৃষবাহন কামেশ্বর শিবের পঞ্চবক্ত্র ও দশভুজ, সিংহ-শব-পদ্মাসনা দেবী মহামায়ার ষড়ানন ও দ্বাদশবাহু। পদ্ম হচ্ছে সিংহ আর শব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। তাঁরা

ধারণ করে রয়েছেন শক্তিময়ী দেবীকে। এভাবে দেবীকে অর্চনা করা হয়। উৎসবের সময় এই মূর্তি নিয়ে মন্দিরের বাইরে শোভাযাত্রা করা হয়।

এই হলো বর্তমান কালের কামরূপ কামাখ্যার মোটামুটি বিবরণ। কালিকাপুরাণে প্রাচীন কালের কামাখ্যার বিবরণ আছে।

———